ভ. ভ. ইউদেনিচ

দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা

দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা

В. В. Юденич

Первая помощь при травмах

Москва «Медицина» 1979

ভ. ভ. ইউর্দেনিচ

দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসা

মির প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

আঘাতের দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে আহতকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ সহায়তা সহ মারাত্মক উপসর্গ দেখা দেয়ার ঝুঁকি এড়ান যায়।

পুস্তিকাটিতে রক্তপাত, ক্ষত, অস্থিভঙ্গ, আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গের আঘাত, পোড়া, হিমক্ষত, তড়িতাঘাত ইত্যাদির প্রাথমিক চিকিৎসার পথ ও পদ্ধতি সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্যভাবে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

সূচী

একটি লোকের জীবন ও কাজ তার পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শিল্প ও পরিবহনের উন্নতি, কৃষিব্যবস্থার যন্ত্রীকরণ এবং জীবনযাত্রার গতির সার্বত্রিক ত্বরণ প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের আঘাতের পরিস্থিতি তৈরি করে।

শিল্পসংক্রান্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে সচেতন প্রয়াস এবং নিরাপত্তার কৌশল ও প্রণালীর উন্নতি সত্ত্বেও, কলকারখানায় বিশেষত প্রাত্যহিক জীবনে দুর্ঘটনার হার এখনও যথেষ্ট।

আঘাতের ধরন ও যেভাবে আঘাত আসে সেগুলি বহুবিধ। সেজন্য প্রয়োজন অবিলম্বে প্রাথমিক চিকিৎসা। কারণ এগুলির সঙ্গে জড়িত থাকে বহু জটিল উপসর্গ যা-কিনা মারাত্মক হতে পারে। তাই ঘটনাস্থলেই আহতকে যথাসম্ভব দ্রুত চিকিৎসা-সাহায্য যোগান প্রয়োজন এবং উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ সম্বলিত ও প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারও সম্ভব, এমন প্রতিষ্ঠানে তাকে চিকিৎসার জন্য পাঠান প্রয়োজন।

গভীর-আঘাতপ্রাপ্ত একটি লোকের জীবন এবং পরবর্তী চিকিৎসার ফলাফল প্রায়ই দ্রুত সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল। সাধারণ দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে (অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ইত্যাদি), যানবাহন এবং শিল্পসংক্রান্ত দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে আত্মচিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান এবং অন্যদের সাহায্যদান বিশেষ প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে সবসময়ই চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞানসম্পন্ন লোকের অভাব দেখা যায় এবং তখন আহতদের জীবন নির্ভর করে তাদের নিজের এবং আশপাশের সকলের

উপস্থিতমতো প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রয়োগের জ্ঞানের উপর, নিজেদের ও অন্যদের সাহায্যদানে তাদের সামর্থ্যের উপর।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেদের এবং অপরের প্রাথমিক চিকিৎসা যোগানর পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যাদের চিকিৎসা-প্রশিক্ষণ নেই, তাদের সাহায্যের জন্যই এই পুস্তিকাটি লিখিত।

আঘাত ও প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ

নানা ধরনের যান্ত্রিক, তাপমাত্রগত ও রাসায়নিক হেতু এবং বিদ্যুৎ দ্বারা অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে সৃষ্ট ক্ষতকেই আঘাত বলা হয়। বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের নিরিখে পৃথক পৃথক যৌগিক আঘাতগুলি পরস্পরকে প্রকোপিত করে ও রোগীর অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটায়।

অধিকাংশ দেশেই রেডক্রশ সংস্থা ও জরুরি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় (বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস ইত্যাদি) কিংবা বিরাট কোন দুর্ঘটনা বা ঘটনায় (আগুন, বড় ধরনের সড়ক-দুর্ঘটনা, ভিড়সংশ্লিষ্ট ঘটনা ইত্যাদি) আহতদের সাহায্যের জন্য ওগুলি জোগাড় করা যায়।

কারখানার ও খামারের কাজ উভয়তেই, নানা ধরনের যান মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও চালানোর সময়, খেলাধুলা ও দৌড়ঝাঁপে এবং নিত্যদিনের কাজকর্মে প্রায়শই আঘাত লাগতে পারে। এগুলি সচরাচর আকস্মিকভাবে ঘটে। তাই কার্যত দুর্ঘটনার স্থান ও কাল সম্পর্কে পূর্বানুমান সম্ভব নয়। সেজন্য দুর্ঘটনার অকুস্থলে আহতদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা খুবই কঠিন এবং প্রায়শই প্রাথমিক চিকিৎসা স্বসাহায্যে বা পারস্পরিক সাহায্যে পর্যবসিত হয়, যতক্ষণ-না প্রাথমিক সাহায্য ঘাঁটি, অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী, রেডক্রশ দল, ইত্যাদি থেকে উন্নততর সহায়তা এসে পৌঁছয়।

অবশ্য সাধারণ ক্ষেত্রগুলিতে সাথী, নিকটবর্তী পথিক বা উপস্থিত কারও কাছ থেকে প্রায়ই প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্য পাওয়া যায়।

দুর্ঘটনার সময় অনুপস্থিত কারও পক্ষে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার ক্ষেত্রে আঘাতের সঠিক সময়, স্থান, পরিস্থিতি ও কিসে তা ঘটেছে, সবই

ভালভাবে জানা প্রয়োজন। ওগুলি সচরাচর আঘাতের বৈশিষ্ট্য সনাক্তি এবং দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার সঠিক প্রণালী নির্বাচন সহজতর করে তোলে। রোগী অজ্ঞান থাকলে ও কী ঘটেছে বলতে না পারলে দুর্ঘটনার পরিবেশ ও কীভাবে আঘাতটি লেগেছে তা জানা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

রক্তপাত, অভিঘাত (শক্) ও চেতনাহীনতা দ্বারা জটিল হয়ে-ওঠা মারাত্মক দুর্ঘটনাগুলিতে প্রাথমিক চিকিৎসা খুবই ত্বরিত হওয়া প্রয়োজন।

রোগীর প্রাণরক্ষা ও সম্ভাব্য জটিলতা এড়ানোর উপযোগী সরল অথচ যথেষ্ট সুবিধাজনক ও কার্যকর ব্যবস্থাবলীর একটি সমাহারই হল প্রাথমিক চিকিৎসা।

প্রাথমিক চিকিৎসার সাহায্যদাতার পক্ষে আঘাতের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব নির্ধারণ করতে জানা ও প্রয়োজনবোধে শ্বসন ও হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপের বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, বাহ্যিক রক্তপাত থামান, ক্ষতে পট্টি (ব্যাণ্ডেজ) বাঁধা, অস্থিভঙ্গগ্রস্ত প্রত্যঙ্গকে অনড় করা, রোগীকে যথাযথভাবে তোলা, তাকে সরান, তার পোশাক খোলা, তাকে পরিবহনযানে রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জানা অত্যাবশ্যকীয়। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদাতাদের উদ্যোগ ও জ্ঞান এবং হাতের কাছের সামগ্রীগুলির সদ্ব্যবহারের দক্ষতার উপর রোগীর জীবন প্রায়শই নির্ভরশীল বিধায় তাদের সকলেরই বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবনের মতো উপস্থিতবুদ্ধি থাকা খুবই প্রয়োজন।

একটি ক্ষতের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য আঘাতের জায়গাটিতে পৌঁছনোর জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন। প্রথমে অক্ষত হাত ও পা থেকে পোশাক সরিয়ে শেষে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আহত অংশটি উন্মুক্ত করা হয়।

যখন আঘাত মারাত্মক বিশেষত, অস্থিভঙ্গ সংশ্লিষ্ট এবং রক্তপাত বন্ধ ও প্রত্যঙ্গ অনড় করা প্রয়োজন তখন পোশাক সেলাই বরাবর কেটে বা ছিড়ে ফেলা উচিত। বুটগুলি তলির পেছনের সেলাই বরাবর কেটে ফেলা দরকার। কখনো কখনো পট্টি বাঁধার জন্য পোশাকে যুতসই আকারের একটি ছিদ্র (বা টুকরো) করাই যথেষ্ট।

রোগীকে বহন বা স্থানান্তরে সর্বক্ষেত্রে আনাড়ি নাড়াচড়া, অস্বস্তিকর
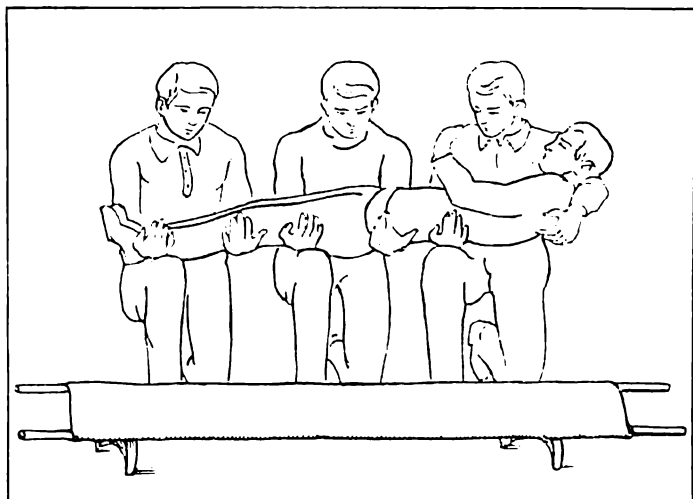
চিত্র 1. তিনজন লোকের সাহায্যে আহতকে স্ট্রেচারে তোলা ও শোয়ানো

অবস্থান, ঝাঁকি ও হঠাৎ উঠা-নামায় যথাসম্ভব কম ব্যথা দেয়ার ও কম বাড়তি ক্ষতি ঘটানোর চেষ্টা করা উচিত।

মারাত্মক আহত ব্যক্তিদের, বিশেষত অস্থিভঙ্গ ও বড় আকারের ক্ষত থাকলে, পায়ের গুল, পাছা ও পিঠে ধরে তিনজন লোকের সাহায্যে তাদের তোলা বা সরানোই সর্বোত্তম ব্যবস্থা (১নং ছবি)। শরীরের আলাদা অংশগুলি যেন বেঁকে বা ঝুলে না যায় সেদিকে নজর রেখে তারা একসঙ্গে ও সতর্কভাবে কাজ করবে। আঘাত ততটা মারাত্মক না হলে কিংবা প্রতিকূল পরিবেশে এক বা দু'জন লোক ও আহতকে বয়ে নিতে পারে। স্ট্রেচারে, কাঁধে, হাতের উপর, একটি খুঁটি বা লাঠির সাহায্যে, কম্বলের উপর, জোড়া-দেয়া স্কী, ইত্যাদির (২-৫ নং ছবি) সাহায্যে আহতদের বয়ে নেওয়া চলে।

স্ট্রেচার না পাওয়া গেলে একটি কোট খুলে ফেলে সেটার হাতা দুটিতে লাঠি ঢুকিয়ে বিকল্প স্ট্রেচার বানান যায় (৫ নং ছবি)। এভাবে ভাঁজ-করা কম্বল, ব্যাগ বা ফিতাও ব্যবহৃত হতে পারে।

আহতের অবস্থার প্রতি নজর রাখার সুবিধার জন্য মাথাটা সামনে
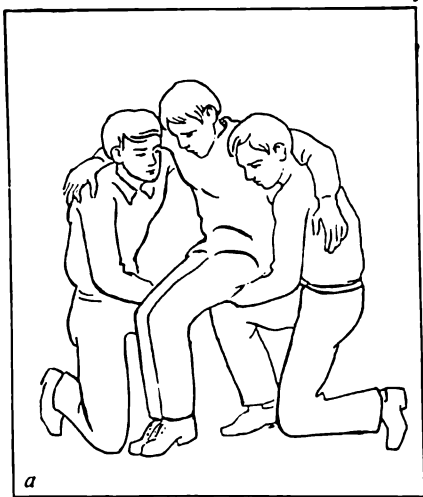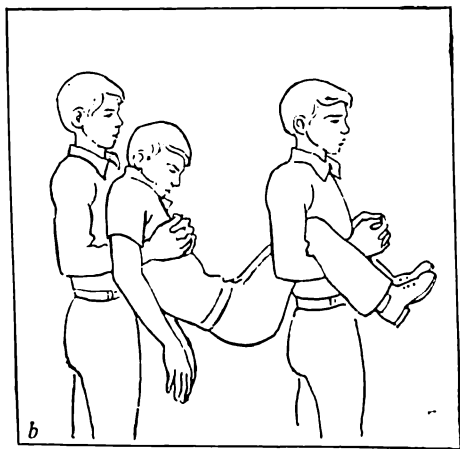
চিত্র 2. a-দু'জন লোকের সাহায্যে আহতকে বহন (প্রথম পদ্ধতি); b-দ্বিতীয় পদ্ধতি

রেখে বয়ে নেওয়া উচিত। তাকে পাহাড়ের উপরের দিকে তোলার জন্য তা সুবিধাজনক। পাহাড় থেকে নিচে অথবা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় স্ট্রেচার সমতলে রাখা এবং তা দু'জন লোকের সাহায্যে একইসঙ্গে তোলা ও নামানো প্রয়োজন।
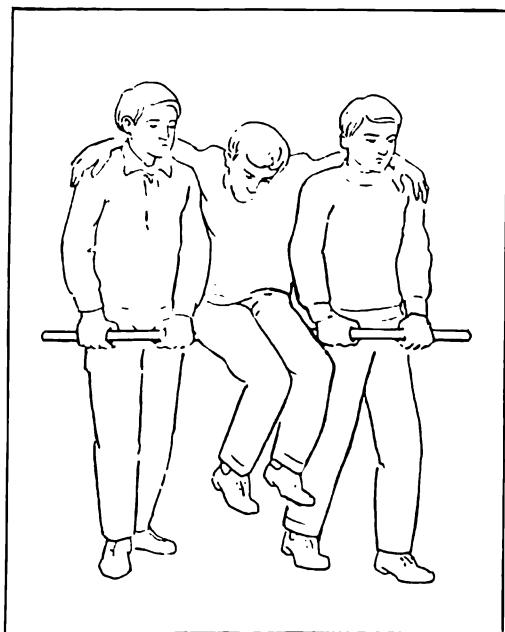
চিত্র 3. একটি লাঠির সাহায্যে আহতকে বহন
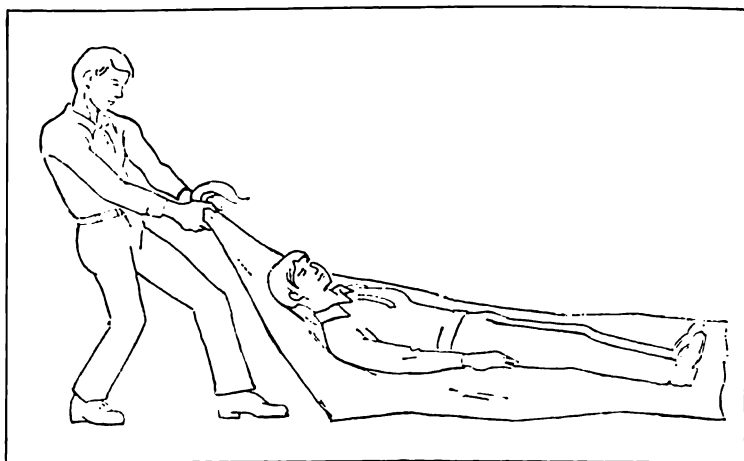
চিত্র 4. কম্বলের সাহায্যে আহতকে স্থানান্তর
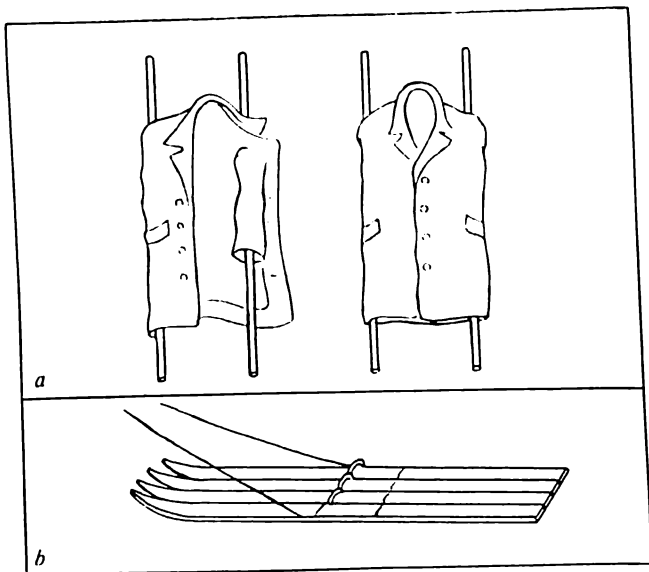
চিত্র 5. আহতকে পরিবহনের জন্য জরুরী উদ্ভাবন; a-ওভারকোটের সাহায্যে স্ট্রেচার; b-স্কি দিয়ে তৈরী স্ট্রেচার

মারাত্মক আহত ব্যক্তিদের বহন ও স্থানান্তরের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত স্ট্রেচারই সর্বোত্তম। এদের, বিশেষত লম্বা হাড় ভাঙ্গলে কিংবা গভীর ক্ষত থাকলে আরেকটি স্ট্রেচারে সরান একাধারে উদ্বেগজনক ও বিপদজনক। সেজন্য একটি স্ট্রেচারে করেই তাদের হাসপাতাল বা অন্যত্র নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আহতকে অ্যাম্বুলেন্সে ওঠানোরও নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। স্ট্রেচার ও রোগীকে মাথার দিকে রোলার বা ট্রলিতে ওঠাতে হয়।

একাধিক আহত থাকলে বিশেষভাবে সাজান অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানে দুই বা তিন স্তরে স্ট্রেচার রাখা চলে। এক্ষেত্রে উপর থেকে ক্রমান্বয়ে নিচে এবং মারাত্মক আহতদের নিচে রাখাই নিয়ম। ঠান্ডা আবহাওয়ায় আহতদেরকে, বিশেষত যারা অভিঘাতপ্রাপ্ত এবং অধিক রক্তক্ষরণে দুর্বল, গরম রাখা প্রয়োজন।

চিত্র 6. ধমনী থেকে রক্তপাত
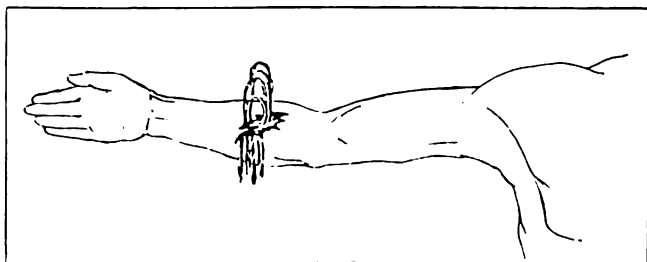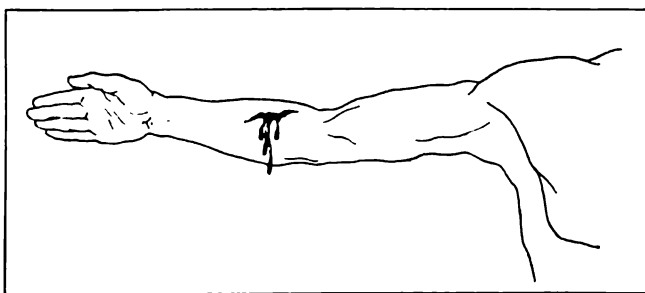
চিত্র 7. শিরা থেকে রক্তপাত

ক্ষত ও রক্তক্ষরণ

চামড়া বা শ্লৈষ্মিকঝিল্লি কেটে-যাওয়া থেকে উদ্ভূত উন্মুক্ত আঘাতকে ক্ষত বলা হয়। এগুলির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য ধরন: বন্দুকের গুলির ক্ষত (বুলেট, কামানের গোলা বা বোমার টুকরা), চেরা (কাটা), আঁচড়, খোঁচা (ছুরিকাঘাত) থেঁত্‌লান ক্ষত, কালশিরা পড়া ও দংশন। ক্ষতগুলি ছিদ্রের মত, অস্পষ্ট, স্পর্শক, অন্তর্ভেদী (করোটি বুক, উদর, সন্ধি ইত্যাদির বদ্ধগহ্বরে) বা অ-অন্তর্ভেদী হতে পারে।

চেরা ও খোঁচা ক্ষতগুলির কিনারা সাধারণত মসৃণ, সুষম ও সামান্য ফাটলযুক্ত হয়ে থাকে। থেঁত্‌লান ক্ষত ও বিশেষত বন্দুকের গুলির ক্ষত অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে এবং তাতে সংক্রমণের জন্য খুবই অনুকূল

পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেজন্য এগুলি খুবই আস্তে আস্তে শুকোয় ও প্রায়ই পুঁজসঞ্চারী হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল কোমল কোষ-কলা ভেদকারী ও দেহগহ্বরে প্রবিষ্ট হয় নি এমন কোন কোন বুলেট-ক্ষত এবং কামানের গোলা ও বোমার টুকরার উপরিগত ক্ষত। দুর্ঘটনাজাত যাবতীয় ক্ষতেই চামড়া, পোশাক, মাটি ও কমবেশি আশপাশের সব কিছু থেকে জীবাণু সংক্রমণ ঘটে। ক্ষত সৃষ্টির উপকরণের সঙ্গে ক্ষতে অনুপ্রবিষ্ট জীবাণু সেখানে বিকাশের চমৎকার মাধ্যম খুঁজে পায়। বিনষ্ট, মৃত কোষ-কলা, বিশেষত বড় আকারের ক্ষতে (যেমন বন্দুকের গুলি ও থেঁত্‌লান ক্ষতে) জীবাণুর খাদ্য-মাধ্যম হয়ে ওঠে।

ক্ষতের সচরাচর সংক্রমণগত জটিলতা হল পুঁজসঞ্চয়। ক্ষত সৃষ্টির পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে স্থানীয়ভাবে বা ব্যাপকভাবে এই লক্ষণ দেখা দেয়। স্থানীয় লক্ষণ হল ক্ষতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি, ক্ষতের কিনারের চামড়ার প্রদাহ ও জ্বরভাব। কখনো কখনো ত্বকনিম্ন কোষ-কলায় সংক্রমণ ঘটলে লসিকানালী বরাবর চামড়ার উপর লাল দাগ ফুটে ওঠে (লসিকাবাহ প্রদাহ)। ক্ষতস্থলের কেন্দ্রস্থ লসিকাগ্রন্থিগুলি বড় ও স্ফীত হয়ে ওঠে আর স্পর্শে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। পায়ের পাতা, হাঁটুর নিচে পায়ের সামনের ক্ষত বা উরু থেঁতলালে আহত এলাকার দিকের কুঁচকিস্থ লসিকাগ্রন্থিতে স্ফীতি দেখা দেয়। বাহুক্ষতের প্রদাহে বগলের লসিকাগ্রন্থি ফুলে ওঠে। লসিকাগ্রন্থির প্রদাহকে লিম্‌ফাডেনিটিস বলে।

ক্ষতে স্পষ্ট পচন দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে: তাপমাত্রা বাড়ে, নাড়ীর গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এবং কখনো কাঁপুনি দেখা দেয়। বড় এলাকা পেকে উঠলে এইসব লক্ষণ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পুঁজসঞ্চয়তা অব্যাহত থাকলে রক্তের ব্যাপক বিষক্রিয়া বা রক্তদূষ্টি (সেপ্টিকামিয়া) দেখা দিতে পারে।

পুঁজসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি নানা ধরনের জীবাণুর কর্মকাণ্ড। তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখ্য: স্টেফাইলোকক্কাই, স্টেপ্টোকক্কাই, নীল পুঁজের বাসিলাস। এইসব জীবাণু ছাড়াও ক্ষতে অন্যান্য জীবাণু থাকাও সম্ভব যেগুলি গ্যাস গ্যাংগ্রিন ঘটাতে পারে। এগুলি থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ (অধিবিষ) স্ফীতি সৃষ্টি করে ও কোষকলায় গ্যাস জমে। এই ধরনের উপসর্গ খুবই মারাত্মক। ক্ষতের সংক্রমণঘটিত জটিলতার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল ধনুষ্টঙ্কার। প্রকৃতিতে বহুব্যাপ্ত টিটেনাস

ব্যাসিলাস এই রোগের উৎস। এই ব্যাসিলাসের স্পোর (রেণু) অত্যন্ত শক্ত এবং মাটি ও নানা জিনিসে সহজলভ্য। ক্ষতের অবস্থা এই জীবাণু বৃদ্ধির অনুকূল হলে টিটেনাস ব্যাসিলাস থেকে নিঃসৃত তীব্র অধিবিষ স্নায়ু-পেশীতন্ত্র আক্রমণ করে, মারাত্মক খিঁচুনি ঘটায় ও রক্তের অক্সিজেনবাহী রক্তকণিকাগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে।

এই মারাত্মক উপসর্গ রোধের জন্য আহত সকল ব্যক্তিকে টিটেনাস অ্যান্টিটক্সিন বা টিটেনাস অ্যানাটক্সিন ইন্‌জেক্‌সন দেয়া খুবই ফলপ্রসূ।

রক্তক্ষরণের ধরন ও প্রাবল্যের তারতম্য সত্ত্বেও প্রত্যেক ক্ষতেই রক্তপাত ঘটে। ধমনী, শিরা, কৈশিকা ও ক্রিয়াতন্তুগত (প্যারেনকাইমেটাস) রক্তক্ষরণ আলাদা ভাবে সনাক্ত করা যায়। রক্ত দেহের বাইরে ক্ষরিত হতে পারে (উপরিগত রক্তক্ষরণ) কিংবা করোটি, বক্ষগহ্বর বা উদরের ভিতর প্রবাহিত হতে পারে (আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ)।

প্রধান ধমনী (ক্যারোটিড, সাবক্ল্যাভিয়ান, অ্যাক্সিলারি, ব্রেসিয়াল, ফেমরেল ও জানুপশ্চাদ ধমনী) আহত হলে প্রবল রক্তক্ষরণ হতে থাকে। রক্ত ধমনী থেকে উচ্চচাপে বহির্গত হয় এবং রক্তক্ষরণ দ্রুত বন্ধ না করলে রক্তপাতের ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

প্রবল, স্পন্দমান, কখনো একটানা উজ্জ্বল লাল রক্তধারা দেখে ধমনীর রক্তক্ষরণ সহজেই সনাক্ত করা যায় (৬ নং ছবি)।

আহত শিরা থেকে শিরাগত রক্তক্ষরণ ঘটে। ধমনীর তুলনায় শিরার রক্তচাপ অনেক কম বিধায় এক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ ঘটে অনেকটা মন্দাবেগে, সমান ধারায় ও রক্ত হয় কালচে-লাল (৭ নং ছবি)। আহত স্থানের উপরের দিকে শিরায় চাপ দিলে রক্তপাত বন্ধ হওয়ার বদলে তা বৃদ্ধি পেতে পারে। সেজন্য প্রবল রক্তপাতের ক্ষেত্রে শরীরের আহত অংশে রক্তপ্রবাহ বন্ধ করার জন্য প্রধান ধমনীটি চেপে ধরা প্রয়োজন।

পেশীসংকোচন ও হৃৎপিণ্ডের 'শোষণ'ক্রিয়ার ফলে শিরারক্ত চালিত হওয়ার প্রেক্ষিতে কোন প্রধান শিরায় (বিশেষত ঘাড়ের) উন্মুক্ত ক্ষত থাকলে বাতাসের বুদ্বুদ বাহির থেকে রক্তে শোষিত হতে পারে। রক্তধারায় অনুপ্রবিষ্ট এইসব বুদ্বুদে হৃৎপিণ্ডের ও মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলি বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ফলত মারাত্মক উপসর্গ কখনো বায়ুজনিত রক্তপ্রবাহবদ্ধতার (এম্বলিজম) মতো চরম অবস্থাও দেখা দেয়।

সাধারণত চামড়া বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিদ্যমান ক্ষুদ্রতম রক্তনালীগুলির (কৈশিকানালী) ক্ষত থেকে কৈশিকানালীর রক্তক্ষরণ ঘটে। এতে রক্ত আহত স্থানের উপরে কিছুক্ষণ ক্ষরিত হয় এবং অচিরেই জমাট বাঁধে ও আপনা থেকেই রক্তপাত বন্ধ হয়ে যায়।

বিশেষভাবে রক্তনালীসমৃদ্ধ আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গসমূহের (যকৃৎ, প্লীহা, কিড্‌নি বা ফুসফুস) আঘাত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ (ক্রিয়াতন্তুগত রক্তক্ষরণ) ঘটে।

ক্ষুদ্র রক্তনালীর ক্ষতজনিত রক্তপাত শরীরের রক্ষামূলক ব্যবস্থার, অর্থাৎ রক্তের তঞ্চন বা জমে যাওয়ার সামর্থ্যের দরুন সাধারণত আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। তঞ্চিত রক্তের জমাট টুকরা রক্তনালীর ক্ষতটি আটকে দেয় ও রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়। বড় রক্তনালী আহত হলে জমাট রক্ত, রক্তচাপের মুখে দাঁড়াতে পারে না এবং রক্তপাত পুরোপুরি বন্ধ হয় না।

সাময়িকভাবে উপরিগত রক্তপাত বন্ধের জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।
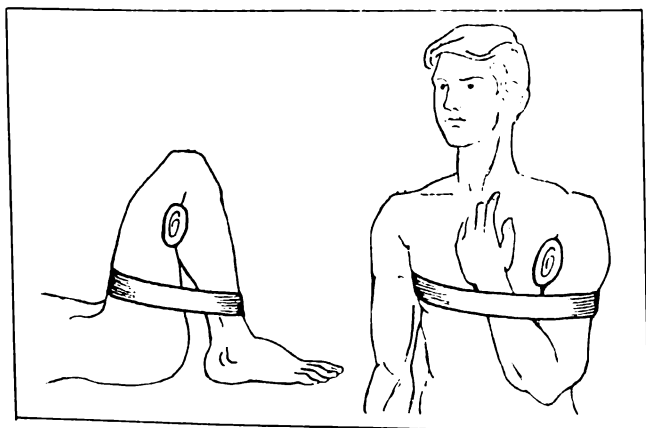
চিত্র ৪. সন্ধিস্থলে হাত-পা যথাসম্ভব ভাঁজ করে রক্তক্ষরণ থামান। বড় বড় ধমনীকে ভালোভাবে চেপে ধরার জন্য বগল ও হাঁটুর নিচে তুলো ও গজ দিয়ে তৈরী রোলার ব্যবহার্য
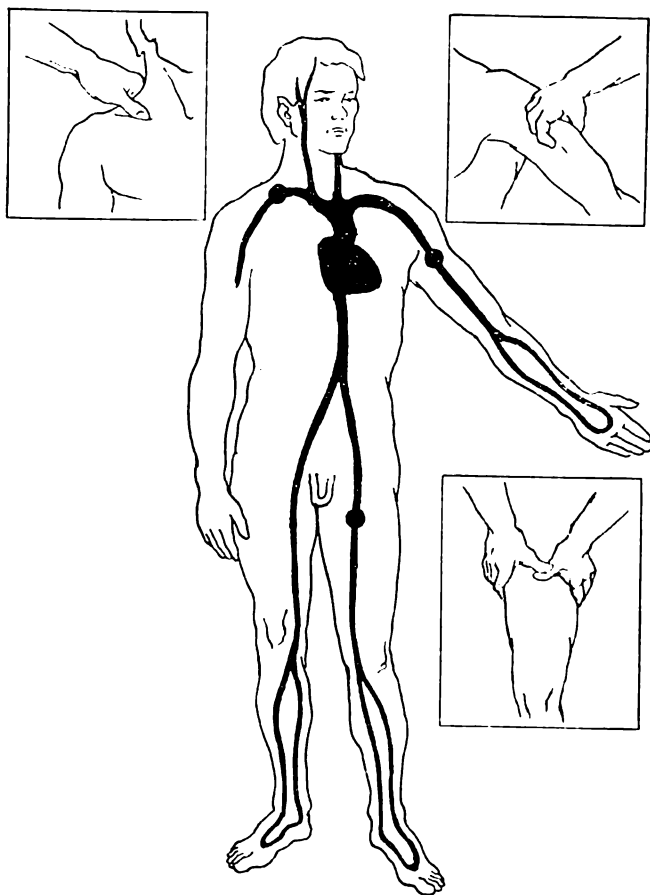
চিত্র 9. প্রধান ধমনীগ্নলি চেপে ধরার প্রধান প্রধান জায়গা

শিরা বা ধমনীর অল্পস্বল্প রক্তপাতের ক্ষেত্রে শক্ত করে পট্টি বাঁধা ও রক্তপাতের জায়গাটি উ'চু করা হয়।

সন্ধিস্থলে হাত বা পা বে'কিয়ে, রক্তনালী চেপে ধরে কখনো কখনো রক্তপাত বন্ধ করা যায়। হাঁটুর নিচে পায়ের সামনের দিকে রক্তপাতের ক্ষেত্রে পা হাঁটুতে যথাসম্ভব প্নরোপ্নরি বাঁকান প্রয়োজন। অগ্রহস্তের (কন্নই থেকে আঙ্নলের ডগা পর্যন্ত) ক্ষত থেকে রক্তপাতের ক্ষেত্রে হাতকে
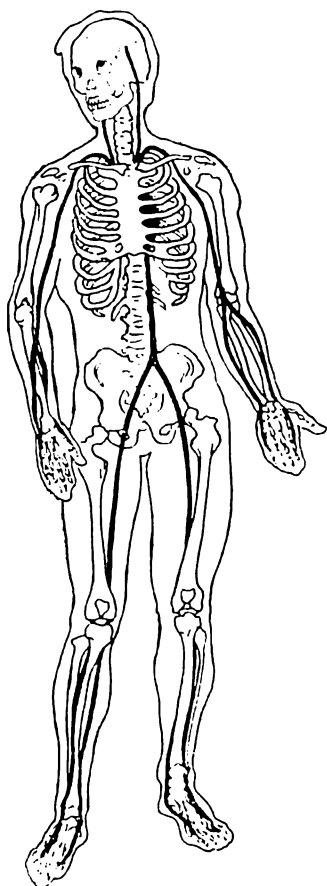
চিত্র 10. শরীরের অস্থিসমূহের সঙ্গে প্রধান প্রধান ধমনীর অবস্থান
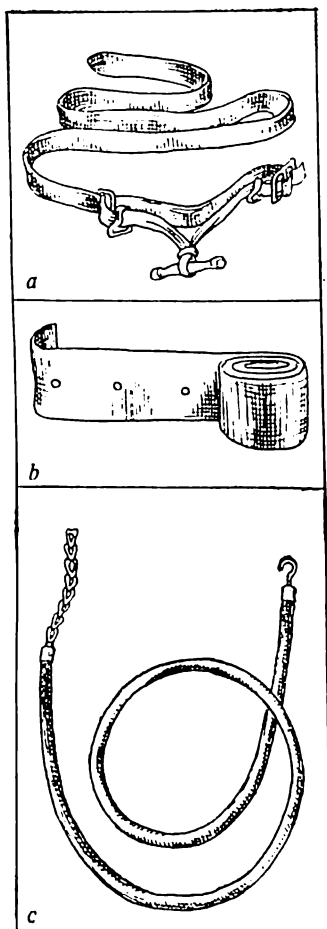
চিত্র 11. পাকা-তাগার রকমফের a-লিনেনের পাকা-তাগা; b-ফিতার তৈরী পাকা-তাগা; c-এসমার্কের পাকা-তাগা

কনুইতে ভাঁজ করা দরকার (৮ নং ছবি)। কাঁধের উপর পেছনের দিকে চাপ দিয়ে কণ্ঠনিম্ন ধমনীকে কণ্ঠাস্থি ও প্রথম পাঁজরের মধ্যে চেপে ধরা যায়। হাতের যেকোন জায়গায় কিংবা কণ্ঠাস্থি বা বগলের নিচের কোন

এলাকার ক্ষত থেকে রক্তপাত কমানোর জন্য পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হতে পারে।

হাত বা পায়ের কোন ক্ষত থেকে ধমনীগত প্রবল ও মারাত্মক রক্তক্ষরণে পাক-তাগা (টুর্নিকেট) ব্যবহারের মতো জরুরি ব্যবস্থাগ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু পাক-তাগা লাগানোর আগে আহত স্থানের উপরের দিকে রক্তক্ষরণশীল রক্তনালীকে অবশ্যই দ্রুত চেপে ধরতে (আঙুলের চাপ) হবে।

মাথা ও কাঁধে রক্তসরবরাহকারী ক্যারোটেড ধমনীকে চতুর্থ গ্রীবাস্থ কশেরুকায় তির্যক প্রবর্ধনের উপর ঘাড়ের মাঝখানে স্টের্নোক্লিডোমেস্টোয়েড পেশীর সামনে চেপে ধরা যায়।

আহত সাবক্লাভিয়ান ধমনীকে কণ্ঠাস্থির উপরের প্রথম কশেরুকায় কণ্ঠাস্থির অভ্যন্তরস্থ তৃতীয়টির কিনারে অবস্থিত একটি স্থানে চেপে ধরা হয়। অ্যাক্সিলারী ধমনীকে বগলে হিউমেরাস অস্থির মাথায় চেপে ধরা যায়। বাহু-ধমনীকে দ্বিমূল পেশীর (বাইসেপ্‌স) ভেতরের কিনারে হিউমেরাসের গায়ে এবং উরুধমনীকে কুঁচকিতে বিটপবাস্থির (পিউবিস) অনুভূমিক শাখায় চেপে ধরা চলে (৯ ও ১০ নং ছবি)

প্রধান ধমনীকে আঙুলে টিপে ধরা একটি কষ্টকর ব্যবস্থা এবং তা অল্প সময়ই শুধু সম্ভবপর। কেননা, একটি রক্তনালীকে অনেকক্ষণ টিপে ধরে রাখা খুবই কঠিন। তদুপরি এতে রক্তনালী বরাবর বিদ্যমান স্নায়ুতে জোরে চাপ পড়ার জন্য তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হয়। তাই পাকা-তাগা লাগানোর আগ অবধিই শুধু রক্তনালীকে আঙুলে টিপে ধরে রাখা উচিত।

অনেক ধরনের পাকা-তাগার মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত তাগাগুলি রবারে তৈরি হয়ে থাকে। এস্‌মার্চের পট্টি বা পাকা-তাগা হল দেড় মিটার লম্বা একটি শক্ত রবার-নল — একপাশে ধাতু-শিকল, অন্য পাশে একটি হুক। অধিকতর স্থিতিস্থাপক রবার-তাগাগুলি তৈরি হয় চেপ্টা ফিতা হিসাবে (১১ নং ছবি)।

সুতোর তৈরি পাকা-তাগাগুলি স্থিতিস্থাপক নয়। সেজন্য এই ধরনের তাগাকে পাকিয়ে শক্ত করতে হয়। পাকা-তাগার বিকল্প হিসাবে রবারের ফিতা বা নল, বেল্ট, দড়ি বা নেক্‌টাই ইত্যাদি সবই ব্যবহার্য (১২ ও ১৩ নং ছবি)। আদর্শ বা তৎক্ষণাৎ তৈরি, সব ধরনের পাকা-তাগাই ক্ষতের উপরে ও যথাসম্ভব কাছে বাঁধাই নিয়ম।
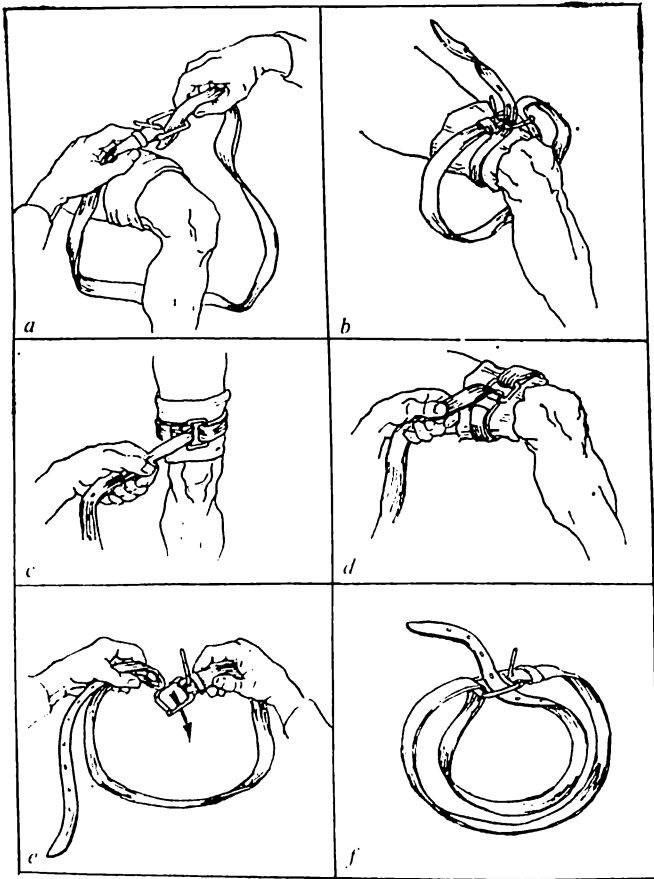
চিত্র 12. পাকা-তাগা হিসেবে পেটির ব্যবহার
a, b, c, d-পাকা-তাগা বাঁধার পর্যায়গুলি; e, f-দুই ফাঁসের পাকা-তাগা প্রস্তুত করার পদ্ধতি

কাঁধের মাঝামাঝি পাকা-তাগা বাধা উচিত নয়। এতে র‍্যাডিয়াল স্নায়ু পিষ্ট হওয়ার ফলে পক্ষাঘাতের আশঙকা থাকে (১৪ নং ছবি)। যন্ত্রণা কমান ও চামড়ার সম্ভাব্য মোচড় এড়ানোর জন্য পাকা-তাগা আবরণ বা নরম প্যাডের (তোয়ালে বা রুমাল কয়েক বার ভাঁজ করে যথাস্থানে বেঁধে) উপর বাঁধা উচিত।
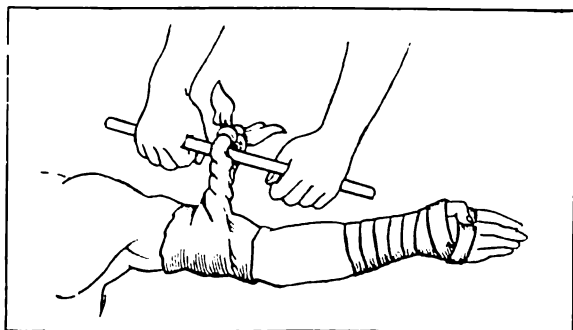
চিত্র 13. পেঁচ দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করা
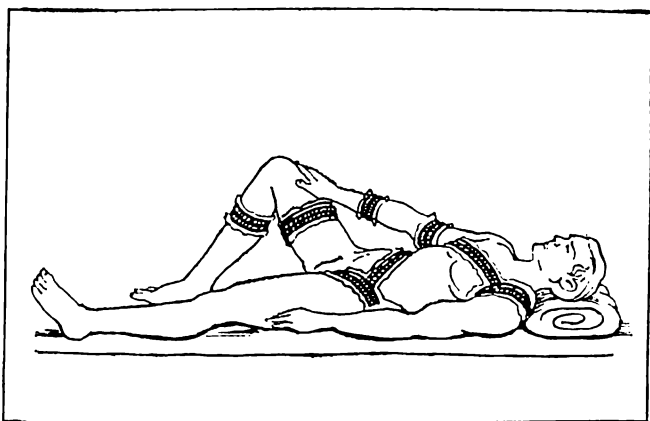
চিত্র 14. পাকা-তাগা বাঁধার জায়গাগুলি

রবারের পাকা-তাগা দু'হাত দিয়ে লম্বা করে প্রত্যঙ্গে কয়েকবার পেঁচিয়ে বাঁধতে হয়। রক্তপাত বন্ধ হওয়ার মতো শক্ত করে তাগা বাঁধা প্রয়োজন এবং এতে প্রত্যঙ্গ ফেকাশে হয়ে উঠবে। অত্যধিক শক্ত করে বাঁধা পাকা-তাগা স্নায়ুর ক্ষতি ঘটিয়ে প্রত্যঙ্গটিকে অসাড় করে দিতে পারে। কিন্তু তাগার বাঁধুনি যথেষ্ট শক্ত না হলে প্রত্যঙ্গ ফেকাশে হওয়ার বদলে নীলচে হয়ে ওঠে এবং শিরাগুলির কৃত্রিম রক্তাধিক্যের দরুন রক্তক্ষরণ বৃদ্ধি পায়।

কাপড়ের তৈরি বিকল্প পাকা-তাগা প্রত্যঙ্গে দু'বার পেঁচিয়ে যথাসম্ভব শক্ত করে বাঁধা উচিত। তারপর গাঁটের মধ্যে একটি লাঠি ঢুকিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা শক্ত করা প্রয়োজন (১৩ নং ছবি)।

পাকা-তাগার বাঁধ এক নাগাড়ে, এক জায়গায়, এক ঘণ্টার বেশি রাখা উচিত নয়। রক্তসঞ্চালন আবার চালু করার জন্য বাঁধ অতঃপর সতর্কভাবে শ্লথ করা প্রয়োজন। রক্তক্ষরণ তখনো অব্যাহত থাকলে তা আরেকটু উপরে আবার শক্ত করে বাঁধা উচিত। কোনক্রমেই ২ ঘণ্টার বেশি পাকা-তাগা ব্যবহার্য নয়। এতে গ্যাংগ্রিন দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্য পাকা-তাগা বাঁধার সময়টি এক টুকরা কাগজে লিখে, চোখে পড়ে এমন জায়গায় এঁটে রাখতে হয়।

পাকা-তাগা লাগান রোগীকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। সেখানে আহত রক্তনালীর মুখগুলি বেঁধে বা রক্তনালী সেলাই করে রক্তপাত পুরোপুরি বন্ধ করা হয়। শীতের আবহাওয়ায় পাকা-তাগা বাঁধা প্রত্যঙ্গ ভাল ভাবে কাপড়ে জড়িয়ে এবং রোগীকে যথাসম্ভব গরম রাখা প্রয়োজন।

তীব্র রক্তাভাব

যথেষ্ট পরিমাণ রক্তপাত ঘটলে তীব্র রক্তাভাব দেখা দেয়। পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে ৫ লিটার রক্ত সঞ্চালিত থাকার প্রেক্ষিতে দেড় লিটারের বেশি রক্তপাত অবশ্যই মারাত্মক বটে। রক্তপাতের হারও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য বড় আকারের কোন ধমনীর ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ সবিশেষ বিপদজনক।

পুরুষের তুলনায় নারীর পক্ষে রক্তক্ষয় সহ্য করা সহজতর। এক বছরের কম বয়সী শিশুর পক্ষে ২৫০-৩০০ মিলিলিটার রক্তক্ষয় খুবই মারাত্মক।

প্রচুর রক্তক্ষয়ের ফলে তীব্র রক্তাভাবের লক্ষণ দেখা দেয়। রোগী সাধারণ অস্বস্তি, পিপাসা ও মাথাঘোরা এবং চোখে অন্ধকার দেখার অভিযোগ করে। ঠোঁট ও চোখের পাতার চামড়া ও শ্লৈষ্মিকঝিল্লি খুবই ফেকাশে হয়ে ওঠে, চোখ কোটরগত হয়, হাই উঠতে থাকে, মুখের গড়ন ছুঁচাল হয়, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয়, নাড়ির বেগ বেড়ে মিনিটে

১২০ পর্যন্ত পেঁছয়, তারপর দুর্বল হয়ে পড়ে ও শেষে নাড়ি পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। রক্তচাপ কমে যায়। অতঃপর দেখা দেয় সংজ্ঞাহীনতা, চোখের মণির স্ফীতি, অসাড়ে মূত্রপাত ও মলত্যাগ। এই ধরনের রোগী তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা-সাহায্য না পেলে মস্তিষ্কের অক্সিজেনক্ষুধা জনিত কারণে শ্বসন ও রক্তসঞ্চালন কেন্দ্রগুলির পক্ষাঘাতে তার মৃত্যু ঘটা সম্ভব।

উপরোক্ত পদ্ধতির যে কোন একটির সাহায্যে বাহ্যিক রক্তপাত তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা প্রয়োজন। তারপর রোগীকে যথেষ্ট পানীয় দেয়া উচিত।

রক্তসঞ্চালনের ঘাটতির দরুন মস্তিষ্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — শ্বসন ও রক্তসঞ্চালন — স্নায়ুকেন্দ্রগুলি প্রথমেই সংকটাপন্ন হয়। সেজন্য মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। বিছানার পায়ের দিক উঁচু করে ও মাথার বালিশ সরিয়ে রোগীকে এমনভাবে শোয়ান উচিত যাতে তার মাথাটি পায়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিচে থাকে। এতে মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন ত্বরান্বিত হয় এবং রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্য কিছুটা সময় পাওয়া যায়। হাসপাতালে রক্তক্ষরণ পুরোপুরি বন্ধ করার পর রোগীকে রক্তভরণ দেয়া হয়।

আঘাতজনিত অভিঘাত

মারাত্মক যান্ত্রিক আঘাত (যৌগিক অস্থিভঙ্গ, বিশেষত বন্দুকের গুলিতে অস্থিভঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ছিড়ে-যাওয়া, অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ বিদারণ) থেকে জায়মান বিক্রিয়া শরীরের অতিগুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ বন্ধ হওয়ার অবস্থা হিসাবে প্রকটিত হতে পারে। এই অবস্থাকেই অভিঘাত (শক্) বলে।

অভিঘাতজনিত এই পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ এখনো সঠিকভাবে না জানা গেলেও রক্তক্ষয় ও স্নায়ুতন্ত্রের অত্যধিক উত্তেজনা এতে অবশ্যই যথেষ্ট ইন্ধন যোগায়। রক্তচাপ হ্রাস ও প্রান্তিক রক্তনালীগুলির সঙ্কোচন কোষকলার পুষ্টিতে বিঘ্ন ঘটায় ও অক্সিজেন-বুভূক্ষা সৃষ্টি করে। আহত এলাকায় প্রোটিনভঙ্গ ও বিপাকক্রিয়ার বিঘ্নজনিত উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ শোষিত হওয়ার ফলে রোগীর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে।

প্রচুর রক্তক্ষয়, হিমায়ন, ক্ষুধা, আহতকে অসতর্কভাবে স্থানান্তরজনিত পরোক্ষ আঘাত, খারাপ রাস্তায় অনুপযোগী যানবাহনে এবং যথাযোগ্য অবেদনক ও ভাঁঙ্গা-হাড়ে বন্ধফলক ছাড়া রোগী স্থানান্তর বস্তুত, অভিঘাতের বিস্তারে ইন্ধন যোগায়।

প্রখ্যাত রুশ সার্জন ন. ই. পিরোগভ আঘাতজনিত অভিঘাতের নিদানিক ছবির একটি চিরায়ত বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি একে 'অসাড়তা' হিসাবে আখ্যায়িত করে লিখেছিলেন: 'হাত বা পা কাটা এমন একটি অসাড় দেহ ক্ষতসজ্জা স্টেশনে অনড় অবস্থায় পড়ে আছে। সে যন্ত্রণায় চিৎকার বা কাতরাচ্ছে না, কোন অনুযোগ জানাচ্ছে না। কোন কিছুতেই সে শরীক হচ্ছে না, কিছুই দাবী করছে না। তার শরীরটি ঠাণ্ডা, মুখটি লাসের মতোই ফেকাশে। চাহনি স্থির ও দূরস্থ। নাড়ি খুবই সূক্ষ্ম, প্রায় পাওয়াই যায় না, কখনো থেমে থাকে। 'অসাড়' ব্যক্তি মোটেই প্রশ্নের উত্তর দেয় না বা প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে ফিসফিস করে, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে। তার শ্বাস-প্রশ্বাসও প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। ক্ষত ও চামড়া প্রায় অসাড়, কিন্তু ক্ষত থেকে উদগত কোন বড় স্নায়ু কোন কিছুর সাহায্যে উত্তেজিত করলে মুখপেশীর সামান্য কুঞ্চনের মাধ্যমেই কেবল সে সাড়া দেয়। কখনো কয়েক ঘণ্টা অবস্থাটি অব্যাহত থাকে, অন্যত্র আমৃত্যু কোনই পরিবর্তন ঘটে না।'

অভিঘাতের তিনটি মাত্রা চিহ্নিতব্য। প্রথম মাত্রার অভিঘাত হল প্রতিকারমূলক অবস্থা — ফেকাশে ভাব ও দুর্বলতা, সাধারণ অবস্থা ভাল, নাড়ির স্পন্দন মিনিটে ৯০-১০০, সর্বোচ্চ রক্তচাপ পারদের ১০০ মিলিমিটারের বেশি। অভিঘাতের দ্বিতীয় মাত্রা — আংশিক প্রতিকারমূলক অবস্থা: সাধারণ পরিস্থিতি খারাপ, দুর্বলতা, ফেকাশে ভাব, উদ্বেগ, ঠাণ্ডা ঘাম, পিপাসা, বমি; নাড়ির স্পন্দন ১২০-১৪০, প্রায় গণনসাধ্য নয়; সর্বোচ্চ রক্তচাপ পারদের ৭০ মিলিমিটারের মতো। অভিঘাতের তৃতীয় পর্যায় হল প্রতিকারহীন অবস্থা — সাধারণ পরিস্থিতি খুবই খারাপ, সুস্পষ্ট দুর্বলতা ও ফেকাশে ভাব, ঠাণ্ডা ঘাম, পিপাসা ও বমি, নাড়ির বেগ ১২০-১৬০, প্রায় গণনসাধ্য নয়, সর্বোচ্চ রক্তচাপ পারদের ৭০ মিলিমিটারের নিচে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: যেকোন রক্তপাত তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা প্রয়োজন। বুকে হা-মুখ ক্ষত থাকলে (খোলা বায়ুসঞ্চিত ফুসফুসাবেষ্টক গহবর)

জীবাণুনাশী পট্টি লাগান দরকার। অস্থিভঙ্গ থাকলে প্রত্যঙ্গকে অনড় রাখতে ও অবেদনক দিতে হয়। রোগীকে গরম রাখা উচিত এবং আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ আহত না হলে গরম চা, কফি, কিংবা এক চুমুক কড়া মদ বা ওয়াইন খেতে দেয়া ভাল।

চাপজনিত লক্ষণপুঞ্জ

যে কোন ভারী জিনিসে (ধ্বসে-পড়া দেয়ালের ইট, মাটি, কাঠের গুঁড়ি ইত্যাদি) দীর্ঘ সময় চাপ পড়ে থাকলে বড়সড়ো কোন ক্ষত বা অস্থিভঙ্গ ছাড়াই অভিঘাতের অনুরূপ অদ্ভুত ধরনের এক নিদানিক ছবি ফুটে ওঠে।

এক্ষেত্রে অভিঘাতের স্বকীয় লক্ষণগুলি (ফেকাশে ভাব, ঠাণ্ডা ঘাম, সাধারণ দুর্বলতা, জড়তা, নিরোধ, রক্তচাপ হ্রাস, দুর্বলতা ও নাড়ির বেগবৃদ্ধি) এক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ দেখা দেয় না। এগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে চাপ সরানোর কয়েক ঘণ্টা পর। দুর্ঘটনার ২-৪ দিন পর কিডনির কাজকলাপের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়, সাধারণ অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং পাণ্ডুরোগ (জণ্ডিস), বমি ও প্রলাপ (যকৃৎ ও কিডনির কার্যকলাপের বিঘ্নজনিত বিষক্রিয়ার ফলে) দেখা দেয়। পা ফুলে যায় এবং কঠিন ও সাদা দাগ সহ নীলচে হয়ে ওঠে। ধমনীগুলিতে স্পন্দন অনুভূত হয় না। রক্তসঞ্চালনের বিঘ্নের দরুন পা অসাড় হয়ে পড়ে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। আহতকে চাপমুক্ত করে তার পাগুলি অনড় করা প্রয়োজন। সম্ভব হলে পাগুলি বরফে ঢেকে দেয়া, অবেদনক লাগান উচিত। অতঃপর রোগীকে শান্তভাবে ও সতর্কতার সঙ্গে যথাসম্ভব দ্রুত হাসপাতালে পাঠান উচিত।

মূর্ছা

মস্তিষ্কে দ্রুত বর্ধমান রক্তাল্পতার দরুন আকস্মিক, সাময়িক মূর্ছা নানা ধরনের ক্ষতের একটি সাধারণ অনুষঙ্গ। প্রবল আবেগগত উত্তেজনা, পট্টি বাঁধার সময় বিশ্রী ধরনের নাড়াচাড়াজনিত ব্যথা অথবা পরিবহনের সময় ঝাঁকির দরুন মূর্ছা ঘটে থাকে।

রোগী মূর্ছা গেলে সে হঠাৎ ফেকাশে হয়ে যায়, জ্ঞান হারায় এবং ডাক বা চিমটি কাটার মতো বাহ্যিক উত্তেজনায় সাড়া দেয় না। নাড়ীর গতি বাড়ে ও দুর্বল হতে থাকে, চোখের মণিগুলি স্ফীত হয় এবং মূর্ছা গভীর হলে সেগুলি আলোয় সাড়া দেয় না। মূর্ছার অবস্থা সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। পায়ের তুলনায় মাথা নিচু করে রোগীকে চিৎ করে শোয়াতে হবে। স্বচ্ছন্দ বাতাস চলাচলের জন্য তার কলার, বেল্ট, গেলিস বা ব্রা আলগা করা কিংবা খুলে দেয়া প্রয়োজন। সামান্য অ্যামো-নিয়াম হাইড্রক্সাইড বা স্মেলিং সল্ট নাকে দেয়া ও গালে হালকাভাবে চড় মারা উচিত। মুখে জলের ছিটা দিতে হবে। কৃত্রিম শ্বসন ও হৃৎপিন্ড উত্তেজক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পট্টি বাঁধার নিয়মাবলী

ক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসার অন্যতম অপরিহার্য সামগ্রী হল মারাত্মক উপসর্গ সৃষ্টির সম্ভাব্য হেতু — জীবাণু ও বাহ্যিক প্রভাব থেকে ক্ষতকে নিরাপদ করার জন্য নির্বীজ পট্টি বাঁধা। ক্ষতগুলি কখনো জল দিয়ে ধোয়া উচিত নয়।

পট্টি বাঁধার আগে ক্ষতের চারপাশের চামড়া সার্জিকাল স্পিরিট বা আয়োডিন টিংচার দিয়ে নির্বীজিত করা প্রয়োজন। তারপর নির্বীজিত পট্টি বাঁধা। প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত ক্ষতসজ্জার বিশেষ প্যাক পাওয়া গেলেই সবচেয়ে ভাল।

সোভিয়েত ঔষধপ্রস্তুত শিল্পে উৎপন্ন ব্যক্তিগত প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষতসজ্জা প্যাকে থাকে ৭ সেণ্টিমিটার চওড়া একটি গজ-পট্টি, ৯×৬ সেণ্টিমিটারের তুলার পাঁজ ও গজের দুটি প্যাড, এগুলির একটি পট্টির একপাশে শক্ত করে আঁটা থাকে, আর অন্যটি ইচ্ছামতো সরান চলে (১৫ নং ছবি)।

ক্ষতসজ্জার উপকরণের ভাঁজে একটি পিন্ মোম-মাখা কাগজে জড়ান থাকে এবং রবারের তৈরি খামে প্যাক করা হয়। তাড়াতাড়ি খোলার জন্য এই খামের কিনারগুলি সামান্য চেরা থাকে।
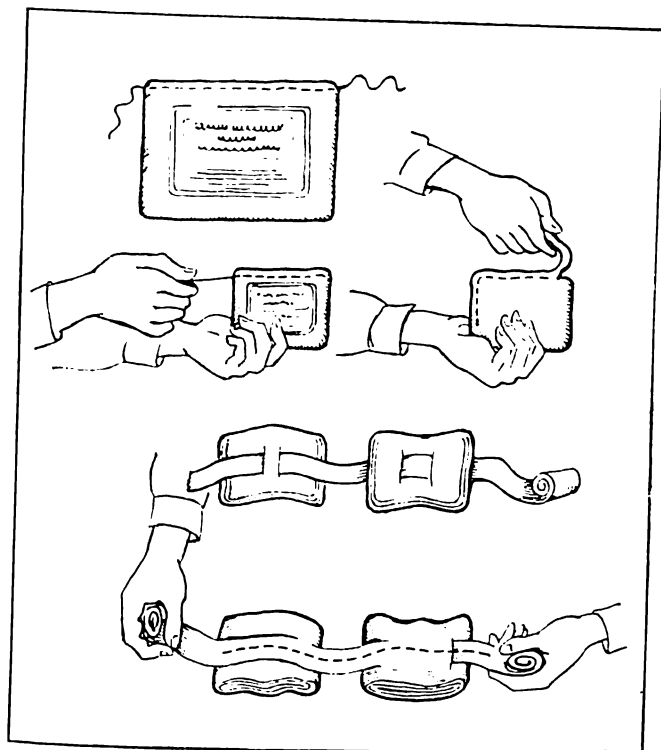
চিত্র 15. ব্যক্তিগত প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ক্ষতসজ্জার প্যাক

খামের কিনার ছিঁড়ে ফেলে মোম-মাখা কাগজে মোড়া উপকরণের প্যাকেটটি সরান হয় এবং প্যাডের যে-দিক ক্ষতে লাগান হবে সেদিকে যাতে ছোঁয়া না লাগে তেমনি সতর্কভাবে কাগজটি খোলা উচিত।

ছিদ্রের ধরনের ক্ষতের ক্ষেত্রে আটকান প্যাডটি ক্ষতের প্রবেশমুখে এবং শিথিলযোগ্য প্যাডটি ক্ষতের বহির্মুখে রেখে পট্টি দিয়ে শক্ত করে বাঁধুন।

ছোট নির্বীজিত প্যাক-করা পট্টিও তৈরি করা হয়। এতে থাকে ১৩ সেণ্টিমিটার লম্বা গজ-পট্টির এক প্রান্তে আটকান ২৪ থেকে ৩২ সেণ্টিমিটারের পাক-খোলা অবস্থায় তুলার পাঁজ ও গজ-প্যাড।
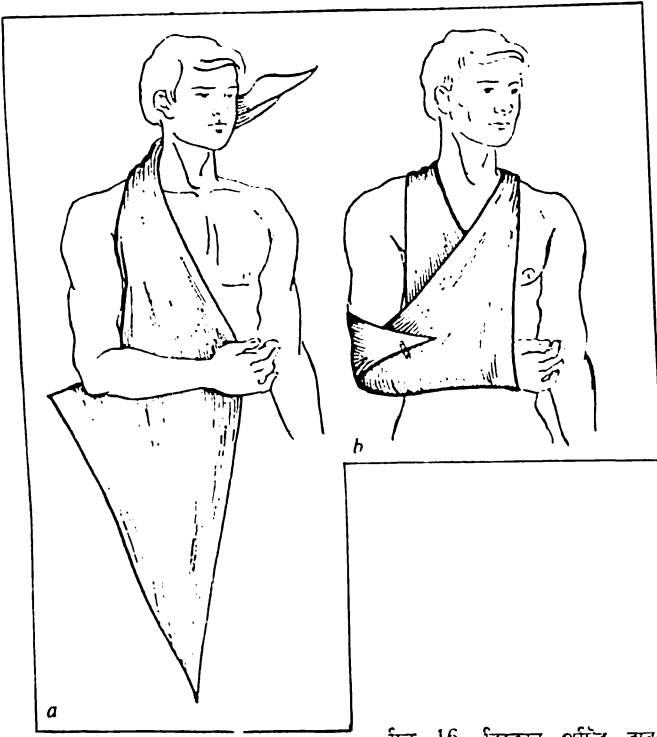
চিত্র 16. ত্রিকোন পট্টির ব্যবহার

ক্ষত বা আঘাত ব্যাপক হলে, বিশেষত পোড়ার ক্ষেত্রে রোগীকে পরিষ্কার, গরম ইস্ত্রি-করা কাপড়ে জড়ান ভাল।

পট্টির রকমফের: নির্ভরযোগ্য (ক্ষতসজ্জাকে ক্ষতে আটকে রাখার জন্য), চাপযুক্ত (শিরারক্ত থামানোর জন্য) ও স্থির (পোষণমূলক)।

ত্রিকোণ পট্টিগুলি কোন কোন অসুখ বা ক্ষতে একটি হাতকে ধরে রাখার পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। যে কোন চৌকো কাপড় কোনাকুনি ভাঁজ করে এগুলি তৈরি করা যায়। কনুইয়ের দিকে চূড়া ও বাহুর ৯০ ডিগ্রিতে কিনারা রেখে পট্টিটি পুরোবাহুর নিচে রাখুন, প্রান্তগুলিতে ঘাড় পেঁচিয়ে পেছনে রিফ-নট বাঁধুন। কনুইর উপর চূড়া ভাঁজ করে সামনের দিকে পিন দিয়ে আটকে দিন (১৬ নং ছবি)।

আরেকটি রকমফের অনুসারে আহত এলাকার দিকে কনুইর উপর
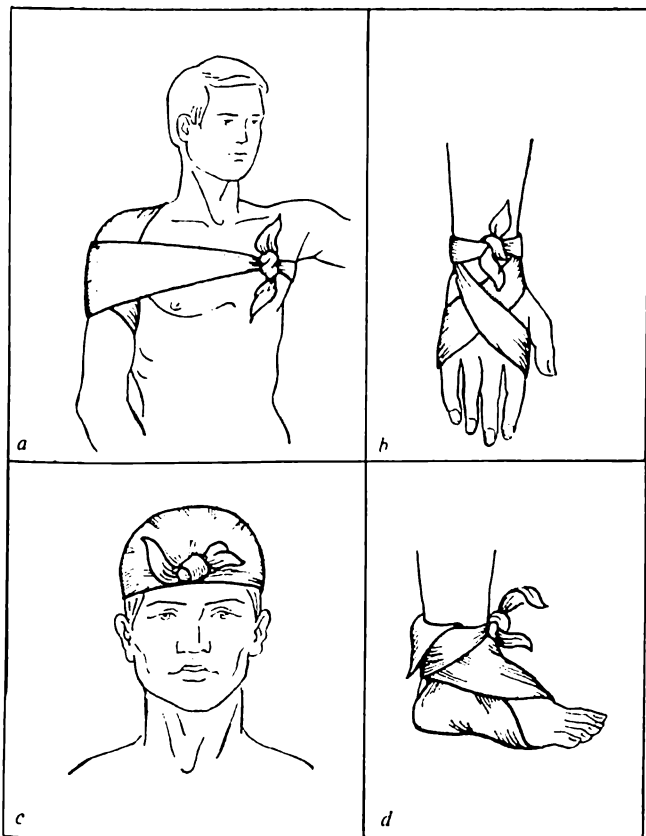
চিত্র 17. ত্রিকোণ পট্টির রকমফের a-কাঁধে; b-কব্জিতে; c-মাথায়; d-পায়ের গোঁড়ালীতে

চূড়া রেখে প্রান্তগুলি বুক-পেঁচিয়ে পেছনে এমনভাবে বাঁধতে হয় যাতে একটি অপরটির চেয়ে লম্বা থাকে। চূড়াটি অতঃপর কনুইর উপর তুলে মুক্ত লম্বা প্রান্তের সঙ্গে বাঁধতে হয়। ত্রিকোণ পট্টির কিনার যথেষ্ট লম্বা না হলে দুই প্রান্তে রোলার পট্টি বা পাকান সুতা এ'টে প্রান্তগুলি লম্বা করা যায়।
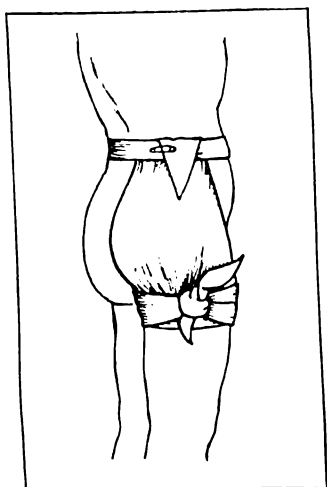
চিত্র 18. নিতম্বের ত্রিকোণ পট্টি

শরীরের যে কোন অংশে ত্রিকোণ পট্টি ব্যবহার্য (১৭ ও ১৮ নং ছবি)।

চার-পুচ্ছ পট্টি এক টুকরা গজ বা রোলার পট্টিকে উভয় প্রান্তে লম্বালম্বি ভাগ করে তৈরি করা চলে। এই পট্টি ফাঁস বা শিকলের আকারে নাক, চিবুক, কপাল বা মাথার পেছনে ছোট ক্ষতসজ্জা আটকে রাখার পক্ষে সুবিধাজনক (১৯ নং ছবি)।

T-পট্টি তৈরি করা যায় দু' টুকরা গজ বা পট্টি দিয়ে, একটিকে অন্যটির মাঝখানে সমকোণে ভাঁজ করে। মূলাধারে ক্ষতসজ্জা আটকে রাখার জন্য তা সুবিধাজনক (২০ নং ছবি)। গজ-পটি বহুল ব্যবহৃত।

পট্টি বাঁধার সময় কয়েকটি নিয়ম পালনীয়। শরীরের পট্টি-বাঁধা অংশ এবং পট্টি বাঁধার পর তা যে-অবস্থানে (শারীরবৃত্তীয় অবস্থান) থাকবে সেটা আরামদায়ক হওয়া প্রয়োজন। নিয়মটি না মানলে এবং প্রত্যঙ্গ

চিত্র 19. চারপুচ্ছ পট্টি

চিত্র 20. মূলাধারের T-পট্টি
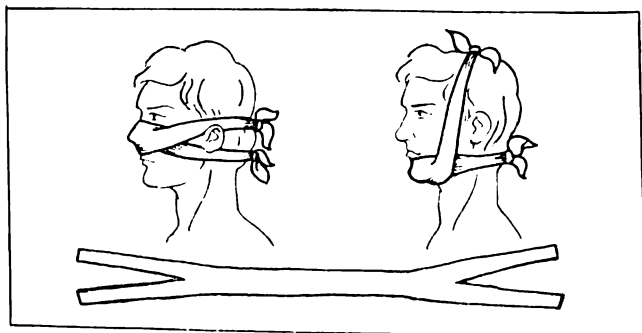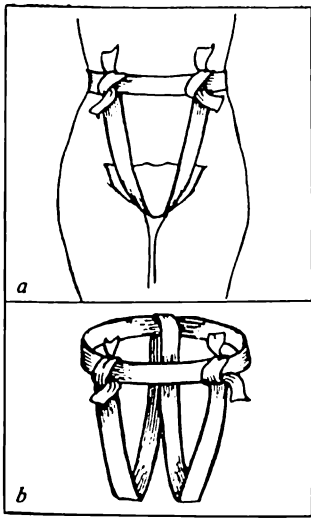
বাঁকান অবস্থায় পট্টি বাঁধলে প্রত্যঙ্গটি সোজা করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতসজ্জা স্থানচ্যুত হবে। অন্যদিকে, সোজা করে রাখা হাতে পট্টি বাঁধলে শেষে হাত কনুইতে বাঁকালে পট্টি বেশি এ'টে গিয়ে হাত চেপে অস্বস্তি ঘটাবে। এজন্য কনুইতে পট্টি বাঁধা উচিত তা নমনীয় অবস্থায় রেখে, ঘাড় শরীর থেকে কিছুটা সরিয়ে, আঙুলগুলি সামান্য নমনীয় করে, যাতে বুড়োআঙুলটি সহজেই নাড়ান যায়। নিচের প্রত্যঙ্গগুলিতে পট্টি বাঁধা উচিত পা ছড়িয়ে ও জঙ্ঘার সঙ্গে পা সমকোণে রেখে।

প্রত্যঙ্গগুলিতে পট্টি বাঁধা উচিত প্রান্ত থেকে কেন্দ্রমুখে। এতে রক্তসঞ্চয়ন ঘটে না। পট্টি বাঁধতে হয় একমুখে, সাধারণত দক্ষিণাবর্তে, প্রতিটি আবর্তে আগেকারটির কিছুটা ঢেকে এবং শক্ত করে এ'টে, যাতে তা সুবিন্যস্তভাবে সমান চাপ দিতে পারে। পট্টি বাঁধা শেষ হলে পট্টির প্রান্ত মাঝখানে লম্বালম্বি চিরে প্রান্তগুলিতে পট্টি-বাঁধা অংশ পে'চিয়ে গি'ট দিতে হবে। রক্তসঞ্চয়নের অসুবিধা এড়ানোর জন্য খুব শক্ত করে পট্টি বাঁধা নিষিদ্ধ। আবার ক্ষত থেকে খসে যেতে পারে ততটা ঢিলে করেও পট্টি বাঁধা অনুচিত।

বৃত্তাকার পে'চালো পট্টি। বাঁ হাতের বুড়োআঙুলে পট্টি-বাঁধা জায়গায় পট্টির প্রান্তটি চেপে ধরে ডান হাতে পট্টিটি খুলে পে'চাতে হবে, পে'চগুলির প্রতিটি আগেকার পে'চের কিছুটা ঢেকে সেটাকে শক্ত করবে (২১ নং ছবি)। শরীরের যেসব অংশ সুষম নয় (জঙ্ঘা, উরু, পুরোবাহু) সেখানে ক্ষতসজ্জা ভালভাবে খাপ খাওয়ান ও আটকে রাখার জন্য উলটপালটি পে'চ দিয়ে পট্টি বাঁধুন (২২ নং ছবি)।

মাথার চাঁদি, মাথার পেছন ও নিচের চোয়ালের ক্ষতে মাথায় পট্টি বাঁধা (শিরপট্টি)। রোলার পট্টি থেকে ৭০-৮০ সেণ্টিমিটার লম্বা একটি
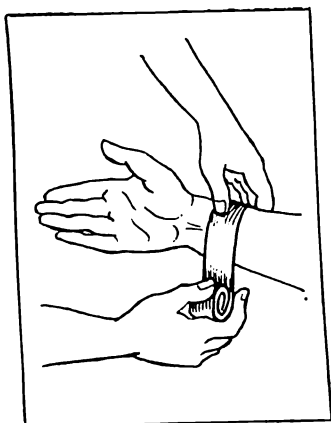
চিত্র 21. পেঁচানো পট্টি
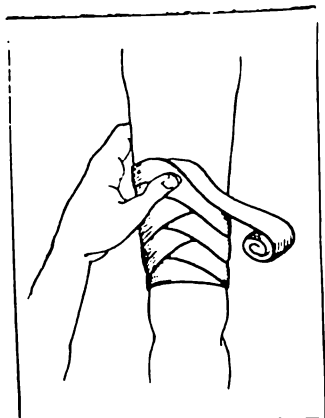
চিত্র 22. উল্টানযোগ্য পেঁচানো পট্টি
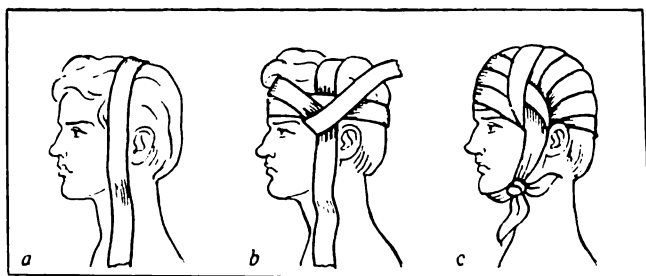
চিত্র 23. মাথায় পট্টি (শিরপট্টি) বাঁধার পর্যায়গুলি

চিত্র 24. ত্রিপত্রিক পট্টি

টুকরা এমনভাবে মাথার চাঁদিতে রাখুন যাতে কানের সামনে সমান লম্বা দু'টি ফিতা ঝুলে থাকে। রোগী নিজে বা সাহায্যকারী ফিতাদুটি শক্ত করে টেনে ধরবে। মাথায় কপালের সমতলে কয়েক পেঁচ রোলার পট্টি লাগান। ফিতাদুটির প্রান্ত নিচের দিকে টেনে একটির প্রান্ত দিয়ে পট্টিটি পেঁচান। তারপর তা কিছুটা কোনাকুনিভাবে মাথার পেছনের দিকে ফিতার অন্য মুখের কাছে নিয়ে সেটাও পেঁচিয়ে আবার ফিরিয়ে এনে কপালের কাছে মাথার সামনের দিকে চেপে ধরুন। প্রথম ফিতাটি আবার পেঁচাতে হবে এবং প্রথম বারের তুলনায় কিছুটা উঁচুতে মাথার পেছনে পট্টিটিকে চেপে ধরুন। দ্বিতীয় ফিতাটি পেঁচান ও পট্টিটিকে মাথার সামনের দিকে বাঁধতে থাকুন। পট্টির পাকগুলি ক্রমাগত মাথার চাঁদির মাঝখানে মিলতে থাকবে এবং মাথাকে টুপির মতো পুরোপুরি ঢেকে দেবে। তারপর খাড়াভাবে লাগান ফিতাগুলির প্রান্তদুটি থুতনির নিচে বাঁধুন (২৩ নং ছবি)।

ডান চোখের পট্টি। একটি রোলার পট্টি মাথায় বৃত্তাকারে, ডান থেকে বাঁয়ে, বামাবর্তে পেঁচিয়ে সেটা আটকান, তারপর কোনাকুনিভাবে মাথার পেছনে নিয়ে, ডান কানের নিচ দিয়ে সামনে এনে ডান চোখের উপরে রাখুন। পাকগুলি যাবে একান্তরভাবে চোখের উপর দিয়ে ও মাথা পেঁচিয়ে (২৪ নং ছবি)।

বাঁ চোখের পট্টি। বাঁ চোখের ক্ষতের ক্ষেত্রে পট্টি বাঁধার সুবিধার জন্য বাঁ থেকে ডানে, বাম কানের নিচ দিয়ে সেটা আবার সামনে এনে এবং পরে গালের উপর দিয়ে আহত চোখটি ঢাকতে হবে। চোখের উপর দিয়ে কোনাকুনি পাকগুলি বৃত্তাকার পাকের সঙ্গে পর্যায়ান্বিত হওয়া প্রয়োজন। **ত্রিপাত্রিক পট্টি** মুখের পাশ ও কান ঢাকতে বা আহত চোয়াল ঠেকানোর জন্য ব্যবহার্য। এতে প্রান্ত দিয়ে মাথা ঘিরে ২-৩ টি পাক লাগাতে হয়। পট্টি মাথার পেছনে কোনাকুনিভাবে নিয়ে নিম্ন চোয়ালের নিচ দিয়ে অন্যপাশে বের করুন। তারপর মাথার চাঁদিতে লম্বালম্বি কয়েকটি পেঁচ দিন এবং পট্টিটিকে মাথার পেছন থেকে সামনে আনুন। মাথা ঘিরে কয়েকটি বৃত্তাকার পাক দেয়ার পর তা মজবুত হবে (২৪ নং ছবি)।

ঘাড়ের পট্টি শ্বাসকষ্ট এড়ানোর জন্য শিথিল ও অপ্রয়োজনীয় পেঁচবর্জিত হওয়া উচিত। ঘাড়ের পেছন ও মাথায় পট্টি বাঁধার জন্য ইংরেজি 'আট' সংখ্যার মতো কাঠামোই সবচেয়ে সুবিধাজনক। এটা
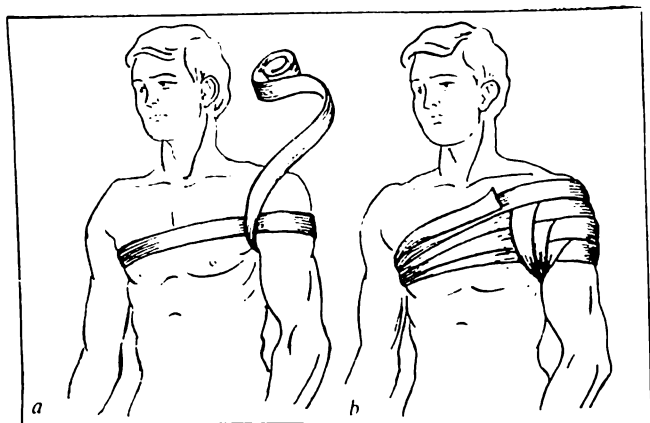
চিত্র 25. স্কন্ধসন্ধির স্পাইকা

মাথার সামনের দিকে কোনাকুনি নামিয়ে ঘাড়ের সামনে দিয়ে নিয়ে ঘাড় পেঁচিয়ে কোনাকুনি কপালের ওপর দিয়ে ফিরিয়ে আবার মাথার পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে এনে মাথা ঘিরে গোল পেঁচ দিয়ে আটকাতে হয়।

ঊর্ধ্ব প্রত্যঙ্গগুলির পট্টি। কাঁধের এলাকা ও বাহবাস্থির (হিউমেরাস) জন্য একটি স্পাইকা (চার-পট্টি) পট্টি ব্যবহৃত হয়। কাঁধের জন্য স্পাইকা পট্টি বাঁধা হয় এভাবে: পট্টিটি সুস্থ দিকের বগলের তলা দিয়ে বুকের সামনের উপরিভাগে ও আহত কাঁধের পাশ দিয়ে এনে সামনে থেকে পেছনে পাক দিয়ে বগলের সামনে দিয়ে বের করে আবার কাঁধ পেঁচিয়ে, কিন্তু এবার পট্টি বুক পেঁচিয়ে পেছনে যাবে। পট্টির পাকগুলি আগের পাকের চেয়ে কিছুটা উপরে ও তার অর্ধেকটা ঢেকে পেচাঁতে হবে। কাঁধের গ্রন্থির পুরোটা ও তার উপরের অংশটি ঢাকা না-পড়া পর্যন্ত পাক দিতে হবে এবং পট্টির প্রান্ত বুকের উপর আটকাবেন (২৫ নং ছবি)।

কব্জির পেছনে 'আট' সংখ্যার মতো পট্টি শুরু করা হয় কব্জির জোড়ার উপরে চক্রাকার আঁটসাঁট পাক দিয়ে। তারপর পট্টি কোনাকুনিভাবে নামিয়ে কব্জির পেছনে নিয়ে করতালুতে আঙুলগুলির গোড়া দিয়ে কব্জি পেঁচিয়ে আবার কব্জিতে এনে মনিবন্ধর (কার্পাস) উপর দিয়ে
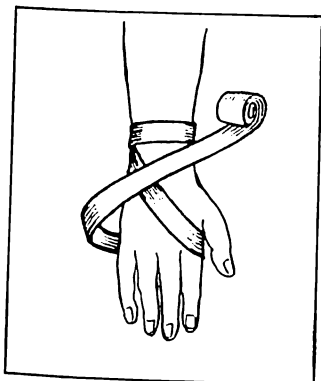
চিত্র 26. কব্জির পেছনে ইংরেজী 8 সংখ্যার মত পট্টি
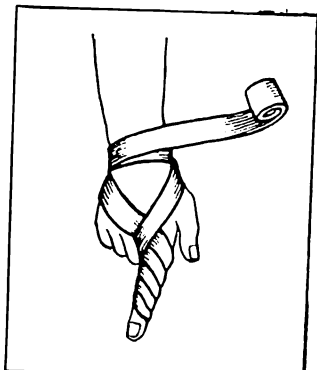
চিত্র 27. আঙুলের পেঁচানো পট্টি
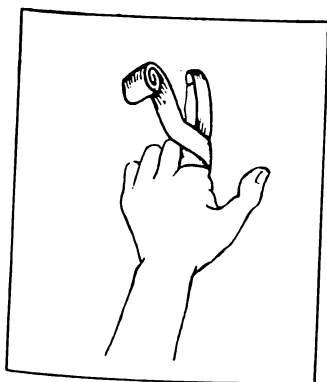
চিত্র 28. আঙুলের ডগার পট্টি
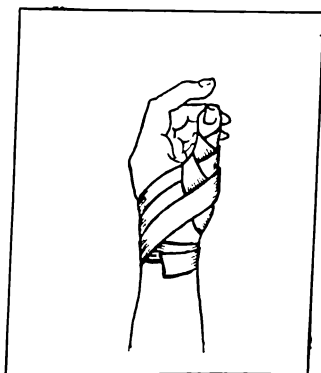
চিত্র 29. বুড়ো আঙুলের স্পাইকা

কড়ে আঙুলের গোড়ায় আগের পাক পেরিয়ে, তারপর কোনাকুনি উপরে ও আবার কব্জি পেঁচিয়ে বাঁধতে হবে (২৬ নং ছবি)।

আঙুলের পট্টি বাঁধা শুরু হয় কব্জি পেঁচিয়ে বৃত্তাকার পাক দিয়ে। তারপর পট্টি কোনাকুনি নিচুভাবে হাতের পেছনে দিয়ে আঙুলের ডগায় আনতে হবে। আঙুল পেঁচিয়ে পাকগুলি গোড়ায় পৌঁছবে, আবার হাতের পেছন দিকে ফিরে কব্জিতে আসবে (২৭ নং ছবি)। পদ্ধতিটি
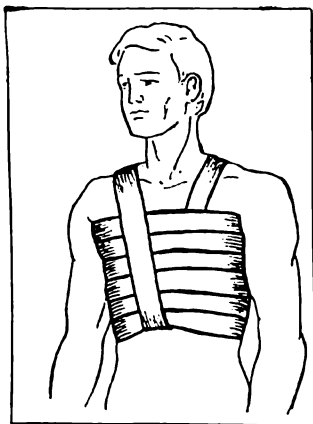
চিত্র 30. বুকের পেঁচানো পট্টি

চিত্র 31. বুকের জন্য ক্রুশাকার পট্টি

ক্রমান্বয়ে সকল আঙুলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। বাঁ হাতে পট্টি বাঁধা শুরু হয় কড়ে আঙুল থেকে আর ডান হাতের ক্ষেত্রে বুড়ো আঙুল থেকে। আঙুলের ডগায় পট্টি বাঁধতে হলে আঙুলের সামনে, করতালু থেকে হাত অবধি একটি রোলার পট্টি বিছিয়ে ডগার উপর ঘুরিয়ে, এবং আঙুলের পাশের দিক যাতে ঢাকে সেভাবে আবার পাক দিতে হবে। তারপর গোড়া থেকে শুরু করে পাক দিয়ে আঙুলটি ঢেকে দিন (২৮ নং ছবি)।

বুড়ো আঙুলে স্পাইকা দিয়ে পট্টি বাঁধা শুরু হয় কব্জি পেঁচিয়ে বৃত্তাকার পাক দিয়ে, হাতের পেছনের দিকে নিয়ে বুড়ো আঙুলের দিকে এনে, তারপর বুড়ো আঙুলের পেছনে পাক দিয়ে আবার কব্জিতে পৌঁছবে। বুড়ো আঙুল পুরোপুরি ঢেকে অনেকগুলি পেঁচ দিন (২৯ নং ছবি)।

বুড়ো আঙুল খালি রেখে হাত ও বাকি চারটি আঙুলে দ্রুত পট্টি বাঁধতে হলে কব্জি পেঁচিয়ে একটি বৃত্তাকার পাক দিন, তারপর হাতের পেছনের দিকে একটি উল্টো পেঁচ দিয়ে আঙুলের ডগাগুলি পাক দিয়ে করতালুতে এনে হাতের পেছনে ফিরিয়ে নিতে হবে। পরপর পাক দিয়ে হাত ঢাকতে হবে এবং পট্টিটি কব্জিতে আটকান থাকবে। আট-পাকের পট্টি দিয়েও হাতে পট্টি বাঁধা যায়।
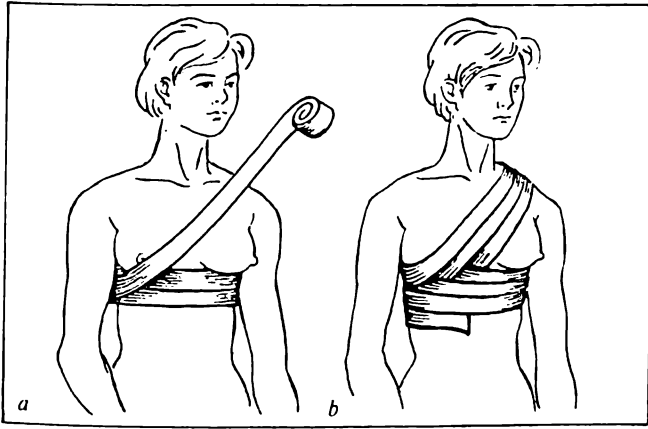
চিত্র 32. স্তনের পট্টি

বুকে পট্টি বাঁধা। বুকের পেঁচাল পট্টি। প্রায় এক মিটার লম্বা একটি পট্টি খোলা অবস্থায় ডান বা বাঁ কাঁধে ঝুলিয়ে রাখুন। একটি রোলার পট্টির কয়েক পাক নিচ থেকে উপরে বুকে পেঁচান ও প্রান্তটি আটকান। প্রথম পট্টির সামনের খোলা প্রান্ত অন্য কাঁধের উপরে আনুন ও অন্য খোলা প্রান্তের সঙ্গে পিঠে বাঁধুন (৩০ নং ছবি)।

বুকের ক্রশাকার পট্টি বাঁধা শুরু হয় বুকের নিচের অংশ ঘিরে একটি রোলার পট্টির কয়েকটি বৃত্তাকার পাক দিয়ে। তারপর একটি পেঁচ ডান থেকে বাঁয়ে বাঁ কাঁধের উপরে নিয়ে, আড়াআড়ি পিঠের উপর দিয়ে বাঁ কাধে, কোনাকুনি পিঠের উপর দিয়ে ডান কাঁধে, তারপর বাঁ বগলের তলা দিয়ে কোনাকুনিভবে সামনে দিয়ে বাঁ কাঁধে নিন। বুক পেঁচিয়ে পট্টি বাঁধুন (৩১ নং ছবি)।

স্তনে ঠেকনা দেয়ার পট্টি। ডান স্তনের জন্য স্তন পেঁচিয়ে ও স্তনের নিচ দিয়ে কোনাকুনি ডান থেকে বাঁয়ে পট্টি বাঁধতে হয়। তারপর পট্টিটি ডান থেকে বাঁয়ে উপরের দিকে নিন, সুস্থ দিকে কাঁধের উপর রাখুন, কোনাকুনি পিঠ ঘুরিয়ে নিচের দিকে ডান বগলে আনুন। তারপর স্তনের অংশ ঢেকে বুক পেঁচিয়ে ও আগের পাকটিকে শক্ত করে পট্টি বাঁধুন। তারপর এটা উপরের দিকে নিয়ে আবার স্তনটি তুলে, আগের পাকের চেয়ে
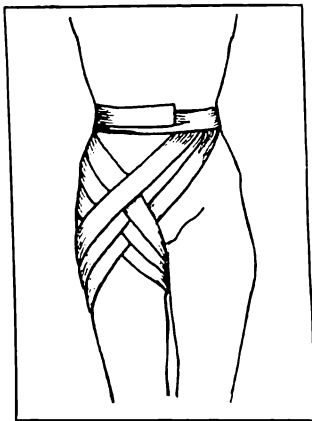
চিত্র 33. কুঁচকির স্পাইকা
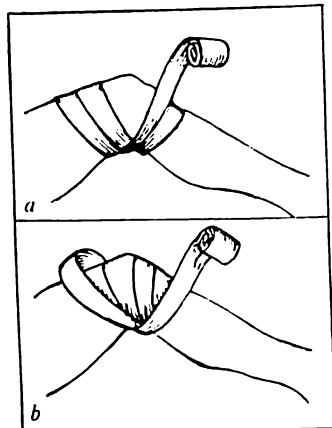
চিত্র 34. হাঁটুর জন্য স্পাইকা

কিছুটা উপরে কোনাকুনি বুক দিয়ে কাঁধ পার করুন। একটার চেয়ে অন্যটি কিছুটা উপরে তুলে আরও কয়েকটি পাক দিন (৩২ নং ছবি)।

পেট ও কুঁচকির পট্টি। পেটের উপরের ও মাঝের অংশের ক্ষত ঢাকতে পেঁচালো পট্টিই সুবিধাজনক। কিন্তু তলপেটে, বিশেষত শ্রোণী (Pelvic) এলাকায় এই ধরনের পট্টি তেমন এঁটে বসে না ও খসে যেতে পারে। সেজন্য তা কুঁচকি, পাছা এবং উরু ও কটি সংলগ্ন এলাকা-ঢাকা একটি স্পাইকা পট্টির সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। কোথায় পট্টির পাকগুলি পারস্পরের মুখোমুখি হবে (সামনে, পেছনে বা পাশে), তদনুসারে পট্টি নানাভাবে বাঁধা যেতে পারে। ৩৩ নং ছবিটি কুঁচকির স্পাইকা পট্টির। পট্টিটি পেট ঘিরে কয়েকটি পেঁচ-এঁটে শক্ত করুন, তারপর পেছন থেকে সামনে, বাঁ থেকে ডানে, কুঁচকির উপর দিয়ে উরুর ভেতরের দিকে উরুর সামনে জড়িয়ে কটি (শ্রোণী) ঘিরে আবার নিচে কুঁচকিতে আনুন। কোথায় ঘোরান হবে সেই অনুসারে ঊর্ধ্বগ বা নিম্নগ স্পাইকা হিসাবে পট্টি বাঁধা হতে পারে: কুঁচকির উপরের দিকে বা উরুর নিচের দিকে। বৃত্তাকার পাক দিয়ে কোমর জড়িয়ে তা বাঁধুন।

পায়ের পট্টি। পুরোবাহু (forearm) ও কাঁধের মতো একই ধরনে উরুতেও পট্টি বাঁধতে হয়। উরুর উপরের অংশে তা আটকান যায়
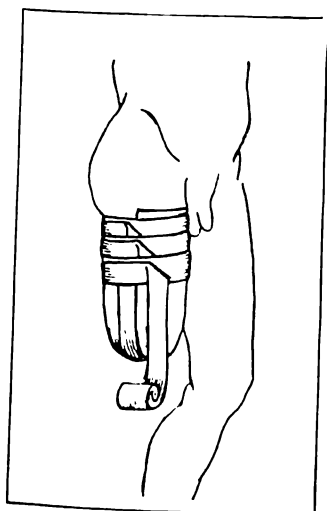
চিত্র 35. কর্টির অবশেষের জন্য উল্টোমুখী পট্টি
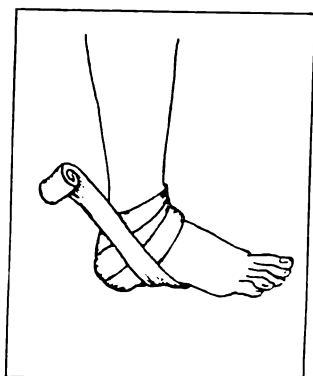
চিত্র 36. গোঁড়ালীর পট্টি
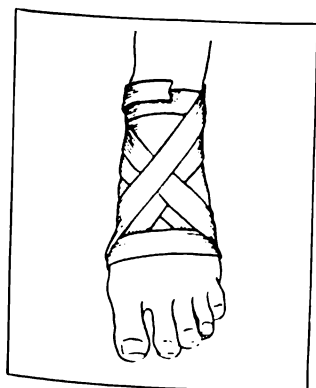
চিত্র 37. গোঁড়ালীর গাঁটের পট্টি
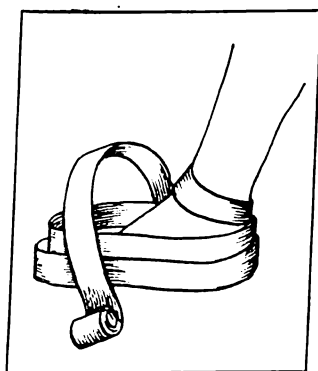
চিত্র 38. পায়ের পাতার পট্টি

শ্রোণীঘেরা একটি স্পাইকা পট্টি বেঁধে। জঙ্ঘায় পট্টি বাঁধা হয় নিচের দিকে সন্ধি পর্যন্ত উলটি-পালটি পাক সহ পেঁচালো পট্টি দিয়ে। কব্জাসন্ধিগুলি, বিশেষত হাঁটুতে এবং উপরের প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে ও কনুইয়ের সন্ধিতে অভিসারী ও অপসারী উলটি-পালটি পেঁচালো পট্টি

(স্পাইকা) ব্যবহৃত হয়। হাঁটুর উপর অভিসারী স্পাইকা বাঁধা শুরু হয় হাঁটুর চাকি পেঁচিয়ে বৃত্তাকার কয়েকটি পাক দিয়ে, পরবর্তী প্রত্যেকটি পাক আগের পাকগুলির উপরের ও নিচের দিকে গিয়ে হাঁটুর পেছনের গর্তে আড়াআড়িভাবে পার হবে (৩৪ নং ছবি)। অপসারী স্পাইকা শুরু হয় হাঁটুসন্ধির উপর ও নিচ ঘিরে বৃত্তাকার পাক দিয়ে। পাকগুলি ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে পুরো হাঁটু ঢেকে ফেলে।

উলটোমুখী পেঁচালো পট্টি শরীরের গোলাকার অংশের পক্ষে সুবিধাজনক। অঙ্গচ্ছেদের ছিন্নাবশেষে পট্টি বাঁধতেও তা ব্যবহৃত হয়। উরু ঘিরে আড়াআড়িভাবে পট্টি আটকতে হয়। তারপর এটি উলটো দিকে ঘুরিয়ে উরুর সামনা বরাবর নামিয়ে এনে ছিন্নাবশেষের উপর দিয়ে পেছনে আনুন (৩৫ নং ছবি)। আড়াআড়ি পাকগুলিতে পেঁছে পট্টিটি আবার উলটো দিকে ঘুরিয়ে একটি বৃত্তাকার পাক আঁটুন। ছিন্নাবশেষ পুরোপুরি ঢাকা না-পড়া অবধি আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি পাক দিতে থাকুন।

অভিসারী বা অপসারী স্পাইকার সাহায্যে গোঁড়ালিতে পট্টি বাঁধা যায়। গোঁড়ালির স্ফীতি থেকে পট্টি বাঁধা শুরু করে প্রথম পাক থেকে পরবর্তী পাকগুলি উপরে ও নিচে চালিয়ে পরস্পরকে আংশিকভাবে ঢাকুন (৩৬ নং ছবি)। গোঁড়ালি ঘিরে একটি আড়াআড়ি পাক কষে ওই পাকগুলিকে শক্ত করে আটকান। গোঁড়ালি খোলা রাখতে হলে আট-পাকের পট্টি দিয়ে গোঁড়ালির গাঁটে পট্টি বাঁধতে হয়। গোঁড়ালির গাঁটের হাড়ের উপরে বৃত্তাকার পাক দিয়ে পট্টি বাঁধা শুরু হয়। রোলার পট্টি তারপর পায়ের পাতার উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে এনে ও পায়ের তলা দিয়ে নিয়ে গোঁড়ালির গাঁটের হাড়ের উপর পায়ের নিচের অংশের পেছন ঘুরিয়ে বৃত্তাকারে আটকান। আট-পাকের চক্রগুলি পুনরাবৃত্তি করুন (৩৭ নং ছবি)। গোঁড়ালি-গাঁটের হাড়ের উপর বৃত্তাকার পাক দিয়ে পট্টিটি আটকান।

পুরো পা ঢাকতে হলে গোঁড়ালির গাঁটের হাড়ের উপর সরল পেঁচ দিয়ে পট্টি বাঁধা শুরু করা হয়। গোঁড়ালি থেকে বুড়ো আঙুল পর্যন্ত পট্টি শ্লথভাবে লম্বালম্বি করে কয়েক বার ঘুরিয়ে তারপর আঙুলগুলি থেকে শুরু করে পা ঘিরে সরল পেঁচ আঁটবেন (৩৮ নং ছবি)।

যেখানে রোলার বা ত্রিকোণ পট্টি ভালভাবে আঁটকে থাকে না বা আটকাতে অনেকটা সময় লাগে সেখানে ছোট ছোট ক্ষতসজ্জা চামড়ায় আটকে দেয়া যায়।

পট্টি বাঁধার জন্য ব্যবহার্য আঠাল প্লাস্টারের টুকরাগুলি এমনভাবে কাটুন যাতে ক্ষতসজ্জার কিনার থেকে বাইরের দিকে ৫-৬ সেণ্টিমিটার লম্বা থাকে।

লঘুতর ক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা

লঘুতর ক্ষত (কাটা, খোঁচা, আঁচড়, ত্বকভ্রংশ, কাঁটা-ফোটা) দৈনন্দিন জীবনের নিয়মিত ঘটনা। যদিও ওই ক্ষতগুলি অমনিতে মারাত্মক নয়, এতে কর্মক্ষমতা নষ্ট হয় না, কিন্তু যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসার অভাবে সপুঁজ প্রদাহজনিত কারণে এগুলিও গুরুতর হয়ে উঠতে পারে।

এমনকি, লঘুতর ক্ষতেও চামড়া কেটে গেলে তৎক্ষণাৎ তাতে ৫ শতাংশ আয়োডিন টিংচার লাগিয়ে নির্বীজিত পট্টির ঢাকনি দেয়া উচিত। চামড়া ও ক্ষতে সংক্রমণ ঘটলে ক্ষতের পাশের চামড়া ০·৫ শতাংশ অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে ও ক্ষত ৩ শতাংশ হাইড্রজেন পেরক্সাইডে মোছা প্রয়োজন। ক্ষতের কিনার মসৃণ ও সুষম, কিন্তু ক্ষতটি ০·৫ সেণ্টিমিটারের বেশি চওড়া হলে কিনারগুলি জুড়ে দেয়াই নিয়ম। সেজন্য ক্ষতের চেয়ে খাটো এক টুকরা আঠাল প্লাস্টার ফালি থেকে কেটে ক্ষতের একপাশে তার এক প্রান্ত এঁটে ক্ষতের অপর কিনার কাছিয়ে এনে প্লাস্টারের অন্য প্রান্ত দিয়ে আটকে দিতে হয়। প্লাস্টার দিয়ে ক্ষত পুরোপুরি ঢেকে ফেলা উচিত নয়, ক্ষতের প্রান্তগুলি খোলা রাখা প্রয়োজন। তারপর প্লাস্টারের উপর ক্ষতে একটি নির্বীজিত পট্টি লাগাতে হয়। লঘুতর ক্ষত বা খোঁচা কলোডিয়ন বা বিশেষ আঠা দিয়ে ঢাকা উচিত।

স্পিরিট-পট্টি দিয়ে খোঁচাক্ষত ঢেকে রাখা বাঞ্ছনীয়।

হাতের বা পায়ের আঙুল থেঁতলালে প্রায়ই নখের তলায় রক্তক্ষরণ ঘটে এবং পরে তাতে পুঁজ জমে তীব্র প্রদাহ দেখে দিতে পারে। এই উপসর্গ রোধের জন্য নখের নিচে জমে-ওঠা রক্ত ডাক্তার বের করে দেবেন ও স্পিরিট-পট্টি লাগাবেন। ব্যবস্থাটি সরল এবং এতে অবেদনক

নিষ্প্রয়োজন। বাইরের কিছু (সহজলক্ষ্য ধাতুসূচ, রেতির টুকরা, ফালি বা কাঠের টুকরা) চামড়া ভেদ করলে সেগুলি সন্না দিয়ে তুলে ক্ষতে আয়োডিন টিংচার লাগিয়ে স্পিরিট-পট্টি বাঁধা উচিত।

সর্পদংশন

বিষাক্ত সাপের কামড়ের ক্ষত জীবনের জন্য মারাত্মক আশংকার বিষয়। এই ধরনের মোট ঘটনার চার-পঞ্চমাংশরেও বেশি এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ঘটে। এককভাবে ভারতেই এই দুর্ঘটনার বার্ষিক সংখ্যা ১ লক্ষ।

বিষাক্ত সাপের উপরের দাঁতের গোড়ায় বিষের থলি থাকে। কামড়ানোর সময় ক্ষতে পেঁাছন বিষ রক্তনালীতে প্রবেশ করে ও রক্তস্রোতের সঙ্গে সারা শরীরে পরিবাহিত হয়।

সর্পবিষে বিদ্যমান নানা ধরনের বিষাক্ত পদার্থের মধ্যে কতকগুলি স্নায়ুতন্ত্র (প্রবাল ও সমুদ্রের সাপের ও কোন কোন র‍্যাট্‌ল সাপের বিষ) আক্রমণ করে, অন্যগুলি রক্তনালী ও হৃৎপিণ্ডের কাজ প্রহত করে ও রক্ততঞ্চন ঘটায়। সেজন্য সাপের বিষক্রিয়ার প্রথম লক্ষণগুলি ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। দংশনের পর ৩০-৯০ মিনিটের মধ্যে সাধারণ বিষক্রিয়া দেখা দেয়। দংশিত লোকটির হৃৎপিণ্ডজ অভিঘাত ঘটতে পারে, কিংবা শ্বসনকেন্দ্র ও পেশীগুলির অসাড়তার জন্য রক্তচাপ হ্রাস ও শ্বাসবন্ধ সহ সে অবসন্ন হয়ে পড়ে।

প্রবাল ও সামুদ্রিক সাপের ছোবলের স্থানীয় লক্ষণ: ফোলা চামড়ায় দুটি ক্ষুদ্র বিন্দু। ভাইপারের (অ্যাডার বা র‍্যাট্‌ল সাপ) দংশনে যন্ত্রণা বোধ হয়, দংশনস্থল পোড়াতে থাকে, চামড়া লালচে হয়ে ফুলে ওঠে, পুরো প্রত্যঙ্গে শিরাগুলির মতো দংশনস্থলেও প্রচুর রক্তপাত ও অন্তর্তঞ্চন (থ্রম্বসিস্‌) ঘটে।

প্রাথমিক চিকিৎসা: ক্ষতস্থল থেকে ১৫ মিনিট ধরে অভ্যন্তরস্থ বস্তুগুলির দ্রুত ও প্রবল চোষণ। লক্ষণীয়, দংশনের প্রথম ৬ মিনিট মুখ দিয়ে এভাবে ক্ষতটি চুষলে তিন-চতুর্থাংশ বিষ বেরিয়ে আসা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া চলে। ক্ষত শুকিয়ে গেলে চামড়া টেনে তুলে ভাঁজ করে ও চাপ দিয়ে সেটা খুলে দংশনের অভ্যন্তরস্থ জিনিসগুলি

মুখ, স্তনের পাম্প বা রাবারের নল দিয়ে চুষে আনা প্রয়োজন। চোষণকারীর মুখে আসা বিষ দ্রুত গলে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। স্মরনীয়, ছোবল থেকে নিঃসৃত বিষের মাত্রাটি এক্ষেত্রে মোটেই বিপজ্জনক নয়, এমনকি সাহায্যকারীর ঠোঁটে ও মুখের আভ্যন্তরীণ আস্তরণে আঁচড় বা ফাটল থাকলেও।

বিষ চুষে তোলার পর দংশনস্থলে আয়োডিন টিংচার, বা অস্ত্রোপচারের স্পিরিট অথবা ব্রিলিয়াণ্ট গ্রীন লাগাতে হবে। শরীরের আক্রান্ত অংশ থেকে বিষযুক্ত লসিকা ধারার বেগ কমানোর জন্য প্রত্যঙ্গটি অনড় রাখা বাঞ্ছনীয়। চা, কফি, ঝোল, বুলিয়ন ইত্যাদির মতো জলীয় পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে সেব্য। দংশিত প্রত্যঙ্গে পাক-তাগা বাঁধা কিংবা বারুদ, অ্যাসিড, ক্ষার, ফুটন্ত তেল ইত্যাদি দিয়ে দংশনস্থল পোড়ান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর রোগীকে দ্রুত নিকটতম হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন যেখানে সর্পবিষনাশী সিরাম (serum) (অ্যাণ্টিগুর্সা, অ্যাণ্টিয়েফা, অ্যাণ্টিকোব্রা ইত্যাদি) মজুত রয়েছে।

সর্পদংশনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে উল্লেখ্য: চামড়ার উঁচু জুতা ও শক্ত করে বোনা পোশাক ব্যবহার, তাঁবু ও বাসস্থানের আশপাশ সতর্কভাবে পরীক্ষা।

স্মর্তব্য, সাপেরা সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না। তারা শুধু আত্মরক্ষা করে থাকে। যারা বিষাক্ত সাপ মাড়ায় বা মারতে ধরতে চেষ্টা করে, তারাই দংশিত হয়।

বদ্ধ ক্ষত

বদ্ধ আঘাতগুলি এমন ধরনের যান্ত্রিক আঘাত, যাতে চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ছিড়ে না। এগুলি: শরীরের বিভিন্ন অংশ এবং করোটি ও মস্তিষ্ক থেঁতলান, অস্থিবন্ধনী মচকান, স্থানচ্যুতি এবং পেশী, বুক ও উদরের অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গগুলির ত্বকনিম্ন বিদারণ। কালশিরা ও থেঁতলান, কোন ভোঁতা বস্তুর আঘাত বা পতন থেকে ঘটতে পারে। লক্ষণগুলি: আঘাতস্থলে ব্যথা, কালশিরা দেখা দেয়া ও কয়েক দিনের মধ্যে সেটা নীল হয়ে ওঠা।

প্রাথমিক চিকিৎসা। ব্যথা কমান ও রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য থেঁতলান এলাকা অনড় করে উঁচুতে রাখা এবং বরফের ব্যাগ বা ঠান্ডা পট্টি দিয়ে ঠান্ডা করা প্রয়োজন। ঠান্ডার ফলে রক্তনালীগুলি সংকুচিত হয় ও রক্তক্ষরণ কমে। থেঁতলানোর দু'তিন দিন পরে নির্গত রক্ত গলানোর জন্য জায়গাটায় গরম সেক (গরম পট্টি, জায়গাটা গরম জলে ধোয়া) দেয়া উচিত।

গরম পট্টি তৈরির নিয়ম: জলে ৮ শতাংশ সার্জিক্যাল স্পিরিট বা কর্পূরতেল মিশিয়ে তাতে কাপড়ের ভাঁজ-করা পট্টি ভিজিয়ে সেটা নিঙড়ে চামড়ার উপর লাগান। পট্টির চেয়ে ২-৩ সেণ্টিমিটার বড় এক টুকরা ওয়েলস্কিন বা মোম-মাখা কাগজ কেটে তা পট্টির উপর রাখুন। তারপর পুরোটাকে তুলোর মোটা প্যাডে ঢেকে রোলার পট্টি দিয়ে শক্ত করে আটকান। পট্টি ৬-৮ ঘণ্টা রাখার পর ভেজা নেকড়া শুকিয়ে যায়। পট্টি সরানোর পর জায়গাটি স্পিরিট দিয়ে মুছে দেয়া প্রয়োজন।

অস্থিবন্ধনী মচকান প্রায়ই ঘটে। আনাড়ি বিচলনের ফলে অস্থিসন্ধি মচকান বা পিছলানোর ফলে অস্থিসন্ধি বেশি ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য সন্ধিঝিল্লি বা অস্থিবন্ধনী কিছুটা ছিঁড়ে যেতে পারে। সন্ধি ঘিরে ব্যথা ও স্ফীতি দেখা দিলেও সন্ধির বাইরে তেমন কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। আহত ব্যক্তি প্রত্যঙ্গটিকে কিছুটা কণ্টসহকারে ব্যবহার করতে পারে। পা ভারী বোধ হয়, হাত নাড়াতে ব্যথা লাগে। কিছুদিন পর চামড়া কাল ও নীল হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। আহত প্রত্যঙ্গ নিশ্চল করা (ত্রিকোণ পট্টি দিয়ে শিকলি বানিয়ে তাতে রাখা, আহত গোঁড়ালির গাঁটে শক্ত করে পট্টি লাগান) অত্যাবশ্যকীয়। ২-৩ দিন পর চিকিৎসা শুরু করুন (গরম পট্টি, আহত স্থানে গরম জলের ধারা, মালিস)।

চ্যুতি একটি গুরুতর আঘাত এবং এতে সন্ধিঝিল্লির বিদারণ এবং সন্ধিবদ্ধ অস্থির সন্ধিতল বিচ্যুত হয়ে থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। চ্যুতি পুনর্স্থাপনের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর আগে স্থিতিকর পট্টি বা বদ্ধফলক বাঁধা উচিত।

অস্থিভঙ্গ উন্মুক্ত বা বন্ধ হতে পারে। উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গে ভাঙ্গা হাড়ের সঙ্গে চামড়াও ছিড়ে গেলে তা খুবই মারাত্মক হয়ে ওঠে। চামড়া ছিড়ে যাওয়ায় ক্ষতে জীবাণু ও সংক্রমণ ঘটার ফলে পুঁযোৎপাদন,

গ্যাস-গ্যাংরিন, বা ধনুষ্টঙ্কার দেখা দিতে পারে। বদ্ধ অস্থিভঙ্গে বহিরাবরণী চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি আটুট থাকার দরুন জীবাণু সংক্রমণ ঘটে না।

লম্বা, নলাকার হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার লক্ষণ হিসাবে ব্যথা, রক্তক্ষরণ, হাত বা পায়ের আহত অংশের বিকৃতি, যেখানে কোন সচলতা থাকার কথা নয় সেখানে অত্যধিক সচলতা, ফাটার শব্দ, ফোলা, নাড়ানোর অক্ষমতা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। হাড়ের টুকরাগুলি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের নানা মাত্রায় বা পরস্পরের সঙ্গে কোনাকুনিভাবে স্থানচ্যুত হওয়ায় প্রত্যঙ্গের বিকৃতি ঘটে।

বন্দুকের গুলির আঘাতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হাড় ও আশপাশের কোমল কোষকলার ব্যাপক ধ্বংস ঘটে। টুকরোগুলি আশপাশের কোষকলা, স্নায়ু ও রক্তনালীগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রক্তপূর্ণ বিধ্বস্ত পেশীগুলি অতঃপর মাটি ও পোশাকের টুকরোর সঙ্গে ক্ষতে অনুপ্রবিষ্ট জীবাণুগুলির বৃদ্ধির চমৎকার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। আহত প্রত্যঙ্গকে অনড় করা প্রয়োজন। রোগী স্থানান্তরের সময় তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। হাড়ের টুকরোগুলি শক্ত করে বাধা উচিত যাতে সেগুলি না নড়ে। অস্থিভঙ্গ অনড় করার নিয়মগুলি 'হাত ও পায়ের আঘাত' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। এগুলি মেনে না চললে আহতের প্রাণের ঝুঁকি সহ গুরুতর উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

মাথা ও মুখের আঘাত

মাথা ও মুখের ক্ষতগুলির ক্ষেত্রে ওই এলাকায় রক্তনালীর ব্যাপক জালবিন্যাসের প্রেক্ষিতে প্রবল রক্তপাত ঘটে।

রক্তপাত বন্ধের জন্য চাপ-পট্টি লাগান প্রয়োজন। কপাল বা পার্শ্বকরোটি থেকে প্রবল রক্তপাতের ক্ষেত্রে একটি শক্ত চাপ-পট্টি বাঁধার আগ অবধি ক্ষতের পাশে কপালপার্শ্বের ধমনী (টেম্পোরাল) চেপে ধরতে হয়।

আহত নাক থেকে রক্তপাতের সময় রোগী নিশ্চুপ থাকবে এবং নাক ঝাড়বে না। নাক ও মাথার পেছনে বরফ, ঠাণ্ডা জলের ব্যাগ বা ঠাণ্ডা

পট্টি দেয়া উচিত। তুলোর ছোট ছোট পিন্ড নাসারন্ধ্রে ঢুকান এবং নাসাপুট আঙুল দিয়ে জোরে যথাসম্ভব উঁচু করে চেপে ধরতে হবে। রক্ত যাতে নাসা-গলকোষে না গিয়ে নাসাগহ্বরের সামনে জমাট বাঁধে সেজন্য মাথাটা কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকান প্রয়োজন।

করোটি-গুরুমস্তিষ্কের বদ্ধ আঘাতই করোটি ও মস্তিষ্কের আঘাতগুলির মধ্যে সচরাচর বেশী দেখা যায়। মাথায় প্রচন্ড ঘুসি, প্রবল ঝাঁকুনি বা শরীরের প্রত্যাগতির ফলেই এমনটি ঘটে।

এই আঘাতে কোন স্থানীয় লক্ষণ প্রায়ই চোখে পড়ে না অথবা কেবল উপরিভাগ থেঁতলান, মুখ ও তালুতে কালশিরা দেখা যায়। কিন্তু এতে করোটির ভেতরে মস্তিষ্কের আঘাত লাগেনি তা বোঝায় না। এক্ষেত্রে মস্তিষ্ক থেঁতলাতে বা তাতে ঝাঁকি লাগতে পারে।

আঘাতের ফলে মস্তিষ্কের গহ্বরগুলিতে রক্ত ও তরল সঞ্চালন বিঘ্নিত হয়। মস্তিষ্কবস্তুতে নানা মাত্রার রক্তক্ষরণ ও স্থানিকতা ঘটে এবং তা ফুলে ওঠে। মধ্যম ধরনের আঘাতে এই পরিবর্তনগুলি গুরুমস্তিষ্কের বহিস্তরে নিষ্ক্রিয়তা ঘটায়। এই জাতীয় গুরুতর আঘাতের ফলে অতিগুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ — শ্বসন ও রক্তসঞ্চালন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মস্তিষ্ক-ঝাঁকানির ক্ষেত্রে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অল্প সময় (কয়েক মিনিট) বা কয়েক ঘণ্টার জন্য সংজ্ঞালোপ ঘটে। তদুপরি, বমি, নাড়ীর গতিহ্রাস (কখনো ত্বরণবৃদ্ধি), আঘাতের অব্যবহিত আগের ঘটনাবলী সম্পর্কে স্মৃতিভ্রংশ দেখা দেয়। রোগী সাধারণ দুর্বলতা ও মাথাধরার কথা বলে, আঘাত সংশ্লিষ্ট কিছুই স্মরণ করতে পারে না।

মস্তিষ্ক থেঁতলান খুবই গুরুতর ব্যাপার, যদিও গোড়ার দিকে তাতে মস্তিষ্ক-ঝাঁকানির অনুরূপ লক্ষণগুলিই শুধু প্রকটিত হয়। শেষে রোগলক্ষণগুলি দূর হওয়ার বদলে বরং বৃদ্ধি পেতে থাকে। তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞালোপ না ঘটলেও আহত রক্তনালী থেকে রক্তপাতের দরুন মস্তিষ্কে চাপসৃষ্টির ফলে ১-২ ঘণ্টা পর রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পেশীর পক্ষাঘাত ও খিচুঁনি দেখা দেয়।

করোটির এবং বিশেষত করোটিতলের অস্থিভঙ্গগুলি আরও বিপজ্জনক। এগুলি খোলা ও বদ্ধ হতে পারে। হাড়ের টুকরাগুলি

প্রায়ই করোটিগহ্বরে ঢুকে গিয়ে দৃঢ়মাত্রিকা (মস্তিষ্কের বহিস্থ আবরণীর পুরো ঝিল্লি), মস্তিষ্কবস্তু ও রক্তনালীগুলিকে আহত করে।

করোটিভঙ্গের অধিকাংশ ঘটনায় আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং বমি, নাড়ীর মন্থরতা ও মস্তিষ্কঝাঁকানির স্বকীয় অন্যান্য লক্ষণগুলি দেখা দেয়। তদুপরি মস্তিষ্কের কোন কোন অংশের কার্যকরতা লোপ পায় এবং ফলত হাত-পা অসাড় হয়ে পড়ে, চোখের বিচলনে বিঘ্ন ও মুখবিকৃতি ঘটে, কথা জড়িয়ে যায়।

করোটিতলের অস্থিভঙ্গের লক্ষণের মধ্যে উল্লেখ্য: গভীর সংজ্ঞাহীনতা, নাক, কান ও মুখ থেকে অবিরাম রক্তপাত, কখনো-বা মেরুদণ্ড-তরল ক্ষরণ ও চোখ ঘিরে রক্তপাত।

কেবল একজন ডাক্তারের পক্ষেই করোটির ক্ষতির মাত্রা নির্ণয় সম্ভবপর।

মস্তিষ্ক ও করোটির ক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা। আহত ব্যক্তি অজ্ঞান থাকলে এবং জিহ্বা ভিতরে ঢুকে যাওয়ায় কিংবা মুখ ও নাসাগহ্বর বমিতে ভরে ওঠায় শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে মুখ পরিষ্কার করা, নিচের চোয়াল সামনে টেনে আনা ও জিহ্বা আটকে দেয়া প্রয়োজন। রোগীকে পাশ-ফিরে শোয়ান, মাথায় বরফ বা ঠাণ্ডা পট্টি দেয়া এবং ঝাঁকি এড়িয়ে দ্রুত হাসপাতালে পাঠান উচিত।

মাথার ক্ষতে সেখানকার চুল কামিয়ে বা ছোট করে ছেঁটে চামড়ায় নির্বীজক মাখাতে ও নির্বীজিত পট্টি বাঁধতে হবে।

নিচের চোয়াল-চ্যুতি ঘটে যখন চিবুকে আঘাত লাগে কিংবা খুব বড় হা-করে মুখ খোলা হয়। এই চ্যুতির লক্ষণগুলি খুবই বিশিষ্ট: ব্যথা, হা বন্ধ করতে না পারা, চিবুক সামনে সরে আসা, আহত এলাকার চোয়ালের ক্যাপিটুলাম অঞ্চল নেমে যাওয়া। রোগীকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে পাঠান আর তা দ্রুত সম্ভব না হলে তাকে সাহায্য করা উচিত।

প্রাথমিক চিকিৎসা। লোকটিকে নিচু টুলে বসান। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদাতা তার পেছনে দাঁড়িয়ে বুড়ো আঙুলগুলি ওর মুখে ঢুকিয়ে তার মাথা ও নিচের চোয়াল শক্ত করে চেপে ধরবেন, যাতে আঙুলগুলি পেষকদন্তের চর্বণতলে পৌঁছয় এবং লোকটির নিম্ন চোয়ালকে নিচের দিকে ধীরে ও শক্ত চাপ দিয়ে নামাতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যে স্থানচ্যুত চোয়ালটি যথাস্থানে পৌঁছবে ও বন্ধ হবে।
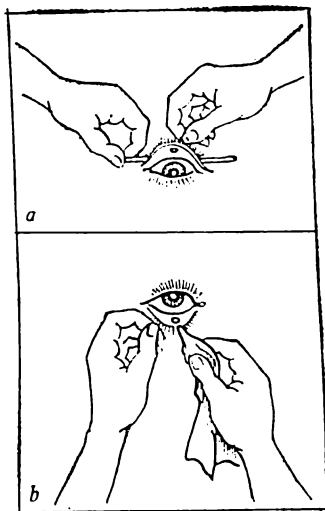
চিত্র 39. a-চোখের পাতার বহিরাবর্তন; b-বাহ্যবস্তু অপসারণ

চোয়ালভঙ্গ উন্মুক্ত বা বন্ধ হতে পারে। বন্দুকের গুলিতে নিচের চোয়াল মারাত্মকভাবে আহত হয়ে থাকে। রক্তক্ষরিত বিরাট ক্ষত ও বিকৃত মুখ এমন ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে তাতে ব্যক্তির অবস্থা বুঝিবা খুবই খারাপ ও হতাশাব্যঞ্জক।

প্রাথমিক চিকিৎসা। চাপ-পট্টির সাহায্যে রক্তপাত বন্ধ করুন। প্রমাণসই বা বিকল্প বন্ধফলক দিয়ে চোয়ালের টুকরোগুলি সাময়িকভাবে আটকান।

উপরের চোয়ালের বন্ধ ভঙ্গগুলি সনাক্ত করা যায় মুখের বিকৃতি, যন্ত্রণাকর স্ফীতি বা স্পর্শ দ্বারা মুখাস্থিগুলির অসম আকৃতির সাহায্যে।

উপরের চোয়াল অক্ষত থাকলে ও তাতে যথেষ্ট সংখ্যক দাঁত টিকে থাকলে নিচের চোয়ালের ভাঙ্গা টুকরোগুলিকে যথাস্থানে বসিয়ে শক্ত হস্তবন্ধনী বা গজ-পট্টি দিয়ে বাঁধা প্রয়োজন। নিচের চোয়ালের কিনারের সমান্তরালে গজ-রোলার পট্টি লাগান বাঞ্ছনীয়।

বন্দুকের গুলিতে নিচের চোয়ালের ব্যাপক ক্ষতির ফলে শ্বাসনালীতে রক্তধারা প্রবেশ করতে, জিহবা পেছনে ঢুকে যেতে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটতে পারে। অজ্ঞান রোগীর ঢুকে-যাওয়া জিহবাটি টেনে বের করে প্রাথমিক চিকিৎসার-ব্যাগের সেফটিপিন দিয়ে তাতে চিমটি-কাটা ও শক্ত করে পট্টি বাঁধা উচিত।

আহতকে এমনভাবে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন যাতে তার ক্ষতটি সবচেয়ে উপরের দিকে ও মাথা পাশে ঘুরান থাকে।

সচরাচর যেসব **চক্ষুক্ষত** ঘটে তন্মধ্যে উল্লেখ্য: পোড়া ও বাহ্যবস্তু দ্বারা অক্ষিগোলক ভেদজনিত লঘুতর ক্ষত।

বাহ্যবস্তুতে চোখ বিদ্ধ হলে উপদাহ, ব্যথা ও জলপাত দেখা দেয়।

বাহ্য পদার্থে (ধূলিকণা, ঝুল বা ছোট পোকা) শ্বেতপটল বা অক্ষিঝিল্লি বিদ্ধ না হলে অন্যের সাহায্যে সেগুলি সরান যায়। এজন্য চোখের পাতা সামনে টানা ও কখনো উলটান হয়। উপরের পাতা সামনে ও নিচের দিকে টেনে এবং তর্জনী এটির তলে রেখে উপরের দিকে চাপ দিয়ে চোখের পাতা উলটাতে হয়। নিচের পাতা নিচের দিকে টেনে এনে এটির গোড়ায় আঙুল চেপে ওটির শ্লৈষ্মিকঝিল্লি পরীক্ষা করা যায়।

অক্ষিঝিল্লির গহ্বরে ভাসমান মুক্ত বাহ্যবস্তু পরিষ্কার রুমালের কোনা বা গজ দিয়ে তুলে আনতে হয় (৩৯ নং ছবি)।

চোখে অঢেল ধুলো পড়লে চোখ জলে ধুয়ে ফেলা উচিত।

চোখে ক্ষার বা অ্যাসিড পড়লে চোখ জলে ধুতে হয়। চোখের ক্ষত বা দাহ নির্বীজিত পট্টিতে বেঁধে রাখা প্রয়োজন।

বুকের ক্ষত

বুকের ক্ষতের মধ্যে পাঁজরের অস্থিভঙ্গের ঘটনাই সর্বাধিক। নিচে পড়ে যাওয়া, ঘুসি বা বুকে চাপের দরুনই তা ঘটে।

অস্থিভঙ্গের লক্ষণ: শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় আহত স্থানে ব্যথা, আহত স্থানে অথবা সামনের বা পাশের দিক থেকে বুকে চাপ দিলে তীব্র ব্যথাবোধ।

ভেঙ্গে-যাওয়া পাঁজরের হাড়ের টুকরাগুলিতে ফুস্ফুসের কোষকলা আহত হতে পারে। এক্ষেত্রে দমকা কাশি শুরু হয়, কফে রক্ত দেখা যায়। দৈবাৎ ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লীগহ্বর থেকে বাতাস ওই আহত ঝিল্লিগহ্বর থেকে চামড়ায় ঢুকে গিয়ে ত্বকনিম্ন বায়ুস্ফীতি ঘটায়। বাতাস বুকের ত্বকনিম্ন কোষকলায় ছড়িয়ে পড়ে ঘড়ে ও মুখে পেঁছলে ত্বকনিম্ন কোষকলা খুবই পুরু হয়ে ও মুখ ফুলে ওঠে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। অনড় করার পট্টি বাঁধা প্রয়োজন। নিঃশ্বাস ফেলার সময় মেরুদণ্ড থেকে পাঁজরের ভাঙ্গা হাড়ের উপর দিয়ে বক্ষাস্থি পর্যন্ত 5 সেণ্টিমিটার চওড়া আঠাল প্লাস্টারের কয়েক পেঁচ লাগান। সাধারণ রোলার পট্টি দিয়ে প্লাস্টার ঢাকুন, কিংবা বুক একটি তোয়ালে দিয়ে ঢেকে প্রান্তগুলি সেলাই করুন।

প্রয়োজনমতো বেদনানাশী বটিকা সেব্য।

বুকের ক্ষতে ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লীগহ্বর বিদ্ধ হয় সাধারণত ছুরিকাঘাতের ঘটনায়। স্বাভাবিকভাবে বুকের ভিতর সর্বদাই একটি ঋণাত্মক চাপ অব্যাহত থাকে এবং ফুসফুস ও ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লির মাঝখানে কোন বাতাস থাকে না। ইণ্টারকস্টাল পেশীগুলি প্রসারিত হলে পাঁজরের হাড়গুলি উঁচু হয়ে ওঠে, মধ্যচ্ছদা চ্যাপ্টা ও বক্ষগহ্বর স্ফীত হয় এবং প্রসারিত বায়ুনল ও ক্লোমনালীর মধ্য দিয়ে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশের পরিস্থিতি দেখা দেয়। বক্ষগহ্বর প্রসারিত হয় ও শ্বাস নেওয়া হয়। বুকের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হলে পাঁজরের হাড়গুলি নেমে যায়, চাপ দিয়ে বাতাসকে বুক থেকে বের করা হয় এবং নিঃশ্বাস পড়ে।

বক্ষপ্রাচীরের দেয়ালে বা ফুসফুসে ক্ষত থাকলে আহত দিকের ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লিগহ্বরের রুদ্ধাবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বক্ষগহ্বরের বা ফুসফুসের ক্ষতের মধ্য দিয়ে বাতাস ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লিগহ্বরে পৌঁছয় এবং সেজন্য ফুসফুস গুটিয়ে যায় ও শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়। ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লিগহ্বরে বায়ুপ্রবেশকে নিউমোথরাক্স বলে। ক্ষত বড় না হলে এবং ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লিগহ্বরে সামান্য বায়ু প্রবেশ করলে ফুসফুস গুটিয়ে গেলেও তাতে শ্বসন সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না। ক্ষতের কিনারগুলি লেগে থাকলে ও ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লিগহ্বরে বাতাস প্রবেশ না করলে যে-পরিস্থিতি দেখা দেয় তাকে বন্ধ নিউমেথরাক্স বলে।

বুকের উন্মুক্ত ক্ষতের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আহত দিকের ফুসফুস গুটিয়ে যায় ও শ্বসনক্রিয়ার শরিক হয় না। বুকের শ্বাসীয়
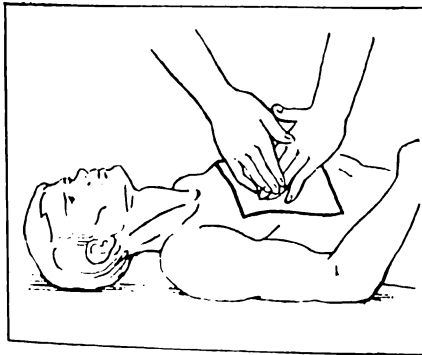
চিত্র 40. ফুসফুসের জন্য অবরোধী পট্টি

বিচলনে বাতাস ক্ষতের মধ্য দিয়ে অবাধে ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লিগহ্বরে যাতায়াত করতে থাকে। বদ্ধাবস্থাভঙ্গ ও শ্বসনক্রিয়া থেকে ফুসফুসের বিরতি ফুসফুসমধ্যগ এলাকার প্রত্যঙ্গগুলি আহত অঞ্চলের দিকে যথেষ্ট সরে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, সুস্থ ফুসফুসের শ্বসনক্রিয়ার সময় ফুসফুসমধ্যগ এলাকার দোলন ঘটায়, ফুসফুসমধ্যগ বৃহৎ রক্তনালীতে মোচড় দিতে থাকে ও স্নায়ুপ্রান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। উন্মুক্ত নিউমোথরাক্স নামক এই গুরুতর পরিস্থিতি অভিঘাতের দরুন প্রায়ই জটিল হয়ে ওঠে ও খুবই মারাত্মক বটে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। ফুসফুসবেষ্টক ঝিল্লিগহ্বরে তৎক্ষণাৎ বায়ুপ্রবেশ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বায়ুরোধী পট্টি লাগান প্রয়োজন। এজন্য পট্টি-প্যাকের রবারমিশ্রিত আবরণীটিই বেশি ভাল ও সুবিধাজনক। এটির ভেতরের তলটি (নির্বীজিত) ক্ষতে লাগান, যাতে ক্ষত ছাড়াও অনেকটা জায়গা ও আশাপাশের চামড়া ঢাকা পড়ে (40 নং ছবি)। পট্টি পুরোপুরি আটকান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্ষতের আশপাশের চামড়ায় ভ্যাসেলিন বা বিশেষ আঠা লাগান ও জায়গাটা রোলার পট্টির কয়েকটি একটানা পাঁক দিয়ে আটকান। প্রাথমিক চিকিৎসার প্যাক পাওয়া না গেলে একটি শক্ত পট্টি বাঁধুন। শ্বসনক্রিয়ার সময় ফুসফুসবেষ্টক খুব শক্ত করে বাঁধা প্রয়োজন (অবরোধী পট্টি)। শরীরের উপরের অংশ ঝিল্লিগহ্বরে বায়ুপ্রবেশ বন্ধের জন্য ক্ষতটি একটি মোটাসোটা পট্টি দিয়ে উঁচু করে আধা-বসান অবস্থায় রোগীকে স্থানান্তর করা সবচেয়ে ভাল। ফুসফুসের ক্ষতের জন্য মুখ দিয়ে প্রচুর রক্ত-থুতু নির্গত হলে রোগীর পক্ষে কথা না বলা, শান্তভাবে শ্বাস ফেলা ও সম্ভব হলে না কাশা উচিত। বুকের উপর বরফের ব্যাগ বা ঠান্ডা পট্টি লাগান, রোগীকে ঠান্ডা লবণজল পান করতে বা বরফের টুকরা চুষতে দিন।

উদরের প্রত্যঙ্গগুলির ক্ষত

উদরপ্রাচীর থেঁৎলানোর সঙ্গে বিদীর্ণ যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র বা পাকস্থলীর মতো আভ্যন্তরীণ ঔদরিক প্রত্যঙ্গগুলির ক্ষত যুক্ত থাকতে পারে। আভ্যন্তরীণ রক্তপাত খুবই মারাত্মক এবং যকৃত, প্লীহা ও মধ্যঝিল্লির রক্তনালী বিদারণের ফলেই তা ঘটে।

ফাঁপা প্রত্যঙ্গগুলির (পাকস্থলী, অন্ত্র) প্রাচীরভঙ্গে উদরান্ত্রিক প্রণালীর জীবাণুযুক্ত উপাদানগুলি উদরগহ্বরে পৌঁছনোর জন্য অন্ত্রচ্ছদপ্রদাহের (পেরিটনাটিস) মতো জটিল উপসর্গ দেখা দেয়। উদরগহ্বরে ক্ষরিত পিত্তরস (যকৃতের ক্ষত, বিশেষত প্রধান পিত্তনালীগুলির ক্ষতের জন্য) বিপজ্জনক পিত্তজনিত অন্ত্রচ্ছদপ্রদাহ ঘটায়।

কিড্নি ও মূত্রস্থলী উদরগহ্বরের বাইরে থাকলেও এগুলি ব্যাপকভাবে বিদীর্ণ হলে রক্ত ও মূত্র মধ্যঝিল্লির পেছনে জমে উঠতে পারে, শ্রোণীর কোমল কোষকলা ভিজিয়ে দেয় ও উদরগহ্বরে পৌঁছে অন্ত্রচ্ছদপ্রদাহ সৃষ্টি করে।

উদরগহ্বরের প্রত্যঙ্গগুলি আহত হলে অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং প্রায়ই আঘাতজনিত অভিঘাতে জটিল হয়ে ওঠে।

আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার লক্ষণসমূহের মধ্যে উল্লেখ্য — মারাত্মক পেটব্যথা — যা আঘাতের শক্তির (পড়ে গিয়ে কোন কঠিন বস্তু পেটে লাগা, বা পেট বিদ্ধ হওয়া, পেটে লাথি, ইত্যাদি) ফল হিসাবে দেখা দেয়।

আহত ব্যক্তি এক্ষেত্রে সাধারণত একপাশে শুয়ে পা গুটিয়ে কাতরাতে থাকে। চামড়া ও দৃশ্যমান শ্লৈষ্মিকঝিল্লিগুলি নিরক্ত দেখায়। পেটের উপরের দিকের প্রাচীর টানটান হয়ে ওঠে এবং স্পর্শে ব্যথা বোধ হয়। নাড়ী ত্বরিত ও দুর্বল থাকে। উদরমধ্য রক্তপাতের ফলে চামড়া বস্তুত পাঁশুটে দেখায়, জিহ্বা শুকিয়ে যায়, প্রবল তৃষ্ণাবোধ হয়, হাই ওঠে, চোখে যেন অন্ধকার নামতে থাকে, মাথা ঘোরে ও বমি হয়। শুয়ে থাকা কখনো অসহ্য হয়ে ওঠে ও রোগী উঠতে ও বসতে চায়। শুইয়ে দিলে সে আবার উঠে বসে — অবস্থাটি আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ আহত হওয়ার একটি লক্ষণবিশেষ।

উদরপ্রাচীরে কোন ক্ষত থাকলে তা উদরগহ্বরে পৌঁছেছে কিংবা আভ্যন্তরীণ কোন প্রত্যঙ্গ আহত হয়েছে কি না সেটা জানা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গভীর ক্ষতের নিশ্চিত লক্ষণ হল ক্ষত থেকে কোন আন্ত্রিক ফাঁস বা অন্ত্রচ্ছদ বেরিয়ে থাকা। অন্যান্য ক্ষেত্রে গভীর ক্ষতগুলি পরোক্ষ তথ্য দেখে সনাক্ত করা যায়: ক্ষতের মুখ ও নির্গমপথের অবস্থান দেখে এবং উপরোক্ত বদ্ধক্ষতের যাবতীয় লক্ষণগুলি মিলিয়ে, যা

উদরমধ্য প্রত্যঙ্গগুলির আঘাতের ক্ষেত্রেও অভিন্ন। কিড্‌নি বা মূত্রস্থলী আহত হলে প্রায়ই প্রস্রাবে রক্ত দেখা যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা। উদরক্ষতে তৎক্ষণাৎ একটি নির্বীজিত পট্টি বাঁধুন। বেরিয়ে আসা আন্ত্রিক ফাঁস বা অন্ত্রচ্ছদ ভেতরে ঠেলে না দিয়ে কয়েকটি বড় বড় পট্টি দিয়ে বা এজন্য ব্যবহার্য পরিষ্কার তোয়ালে বা কাপড়ের টুকরা দিয়ে এগুলির উপর পট্টি লাগান। আহত আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গের রোগীর পক্ষে খাদ্য ও পানীয় নিষিদ্ধ। পা ভাঁজ করে তাকে স্ট্রেচারে শোয়ান। পেটে ঠান্ডা পট্টি দিন। সম্ভাব্য যাবতীয় সতর্কতা সহকারে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠান। এজন্য জরুরি অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

মেরুদণ্ডের ক্ষত

মেরুদণ্ডের ক্ষতের মধ্যে উল্লেখ্য: কশেরুকাভঙ্গ ও কশেরুকাচ্যুতি এবং বন্দুকের গুলির ক্ষত। এগুলি খুবই বিপজ্জনক। কেননা, মেরুদণ্ডের ভিতরে রয়েছে সুষুম্নাকাণ্ড (স্পাইনাল কর্ড) এবং হাড়ের টুকরোয় তা পিষ্ট, গুলির টুকরোর আঘাতে স্থানচ্যুত এবং আংশিক বা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হতে পারে।

সুষুম্নকাণ্ডে ক্ষত হলে সংবেদনা লোপ পায় এবং নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে যায়। শ্রোণী এলাকার প্রত্যঙ্গগুলির কাজে বিঘ্ন ঘটে (প্রস্রাব ও মলত্যাগে বিলম্ব)। ত্রিকাস্থি (স্যাকরাম), গোঁড়ালি ও কাঁধের দিকে শয্যা-ক্ষত দেখা দেয়, রক্তে ব্যাপক সংক্রমণ (সেপ্টিক্যামিয়া) ঘটে এবং এজন্য রোগী অথর্ব হয়ে পড়ে ও শেষাবধি মারা যায়। মাথা মাটিতে বা কোন কঠিন বস্তুতে ধাক্কা খেলে (যেমন কোন অচেনা জায়গায় জলে ডাইভ দিলে) ঘাড়েব কশেরুকাভঙ্গ ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের ক্ষত ছাড়াও রোগী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ডুবে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা। আহত ব্যক্তিকে এমনভাবে তুলতে হবে যাতে তার আহত কশেরুকা বেঁকে, মুচড়ে, বা জায়গা থেকে সরে না যায়। যে কোন বেখেয়াল নাড়াচাড়ার দরুন হাড়ের টুকরোগুলি স্থানচ্যুত হতে ও সুষুম্নাকাণ্ডে বাড়তি ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। কঠিন কিছুর উপর রোগীকে শোয়ান প্রয়োজন। উলটান বা বসানোর চেষ্টা নিষিদ্ধ। কঠিন

তলের জন্য স্ট্রেচারের উপর একটি তক্তা বিছানো উচিত। তক্তা বা যে কোন কঠিন পাত (প্লাইউডের টুকরা) দু'ভাঁজ-করা কম্বলে মোড়া দরকার।

স্ট্রেচার না পাওয়া গেলে তিনজন লোক আহতকে তুলবে: একজন মাথার নিচে, দ্বিতীয়জন কাঁধের হাড়ের নিচে, তৃতীয়জন পাছা ও হাঁটুর নিচে হাত রাখবে, যাতে মেরুদণ্ড না বেঁকে যায়। তক্তা জাতীয় কিছু না পাওয়া গেলে আহতকে স্ট্রেচারে উপুড় করে শুইয়ে বয়ে নিতে হবে।

ঘাড়ের কশেরুকাভঙ্গে তুলো ও গজের মোটা পট্টি কলার হিসাবে বাঁধতে হবে। তুলোর স্তরটি যথেষ্ট পুরু হলে তাতে মাথা বেঁকে যাবে না, জায়গাটাও কিছুটা অনড় থাকবে। পট্টি বাঁধার সময় ঘাড় ও বুকে যেন চাপ না পড়ে। আহতকে ধীরস্থির ও সতর্কভাবে হাসপাতালে নিতে হবে।

শ্রোণীভঙ্গ

শ্রোণীভঙ্গ একটি মারাত্মক আঘাত। সচল দুটি বস্তুর মধ্যে শ্রোণী শক্তভাবে চাপপিষ্ট হলে, চলমান কোন যানের ধাক্কায়, উপর থেকে পড়লে শ্রোণীভঙ্গ ঘটতে পারে। এই ভঙ্গের সঙ্গে ফল হিসাবে প্রায়ই যুক্ত হয় আহত শ্রোণী এলাকার আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গগুলি (মূত্রস্থলী, মূত্রনালী ও অন্ত্র)।

দেহের গভীরে শ্রোণী-অস্থিগুলির অবস্থানের জন্য এই ধরনের অস্থিভঙ্গ সনাক্ত করা যথেষ্ট কঠিন। উল্লেখ্য লক্ষণ: ভঙ্গস্থলে ব্যথাবোধ, বসা বা দাঁড়ানোর অপারগতা। হেলান দেয়া অবস্থায় রোগী তার ছড়ান পা তুলতে পারে না। শ্রোণী-অস্থিগুলিতে বা শ্রোণীর পাশে চাপ দিলে অসহ্য যন্ত্রনাবোধ হয়। আহত মূত্রনালী ও মূত্রস্থলীর দরুন রক্তমিশ্রিত প্রস্রাব বা প্রস্রাবের কষ্ট থেকেও শ্রোণী-অস্থির আঘাত সনাক্ত করা যায়।

হাড়ের টুকরোগুলির পরবর্তী স্থানচ্যুতি ও এগুলির ধারাল কিনারে আভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গগুলি আহত হওয়ার সম্ভাবনা রোধের জন্য নিতম্বাস্থি বরাবর তোয়ালে দিয়ে শ্রোণী বেঁধে রাখা উচিত।

ভাঁজ-করা কম্বল বা ওভারকোট-বিছানো শক্ত স্ট্রেচারে আহতকে রাখুন। মেরুদণ্ডভঙ্গের মতো এখানেও অস্থিভঙ্গ অনড় করার জন্য
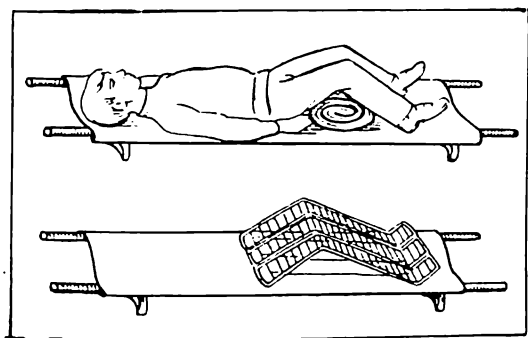
চিত্র 41. শ্রোণীভঙ্গে আহতকে স্থানান্তর

স্ট্রেচারের ক্যানভাসের উপর তক্তা ব্যবহার করুন। ৪১ নং ছবির মতো আহতকে চিৎ-অবস্থায় পা সামান্য ফাঁক করে হাঁটু উঁচু করে বেঁকিয়ে 'সোনা ব্যাঙ'র অবস্থানে শোয়ান। 25-30 সেন্টিমিটার উঁচু তাকিয়াগুলি (ভাঁজ-করা কম্বল বা কাপড়ের পুটলি) হাঁটুর নিচে রেখে দিন এবং হাঁটু দুটিকে সামান্য ফাঁক করার জন্য মাঝখানে তুলোর প্যাড রাখুন। কটির নিচের অংশ ও দুটি গোঁড়ালি একটি রোলার পট্টি দিয়ে শক্ত করে বাঁধুন এবং হাঁটুর নিচের জকিয়া বা বদ্ধফলক স্ট্রেচারের সঙ্গে আটকান।

বাহু ও পায়ের আঘাত

স্কন্ধচ্যুতি — বাহুর আঘাতের মধ্যে এটি প্রায়ই ঘটে। বাহুর অস্বাভাবিক অবস্থান ও সন্ধির পরিবর্তিত আকৃতি থেকে চ্যুতি সনাক্ত করা যায়। আহত ব্যক্তি বাহুটি কনুইতে ভাঁজ-করে ধড়ের একপাশে কিছুটা সেঁটে রাখে।

বাহবাস্থির প্রান্ত সন্ধিকোটরের অবস্থান থেকে সামনে ও নিচে সরে যাওয়ায় কাঁধের কাঠামোর বিকৃতি ঘটে এবং সন্ধিস্থলে কিছুটা ফাঁক সৃষ্টি হয়। সন্ধি নড়ানোর চেষ্টায় তীক্ষ্ন ব্যথাবোধ হয় এবং কাঁধ 'লাফিয়ে ওঠে' (42 নং ছবি)
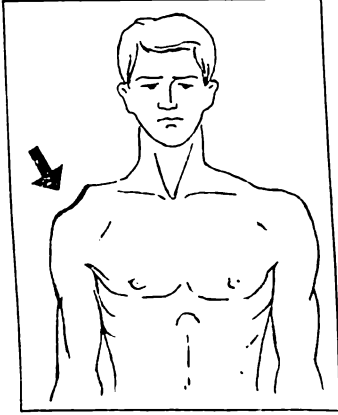
চিত্র 42. ডান কাঁধের স্থানচ্যুতি
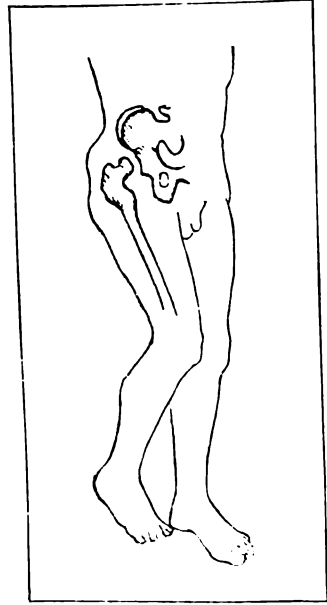
চিত্র 43. ডান শ্রোণীর স্থানচ্যুতি

কনুই-চ্যুতি প্রায়ই ঘটে। এতে কনুইয়ের বিকৃতি দেখা দেয় ও কনুইয়ের কোণটি পেছনের দিকে ছিটকে যায়। হাত নাড়নো খুবই সীমিত ও কষ্টকর হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। ত্রিকোণ পট্টি দিয়ে আহত বাহুটি ঝুলিয়ে আহতকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠান প্রয়োজন। চ্যুতিটি সংশোধনের চেষ্টা নিষিদ্ধ।

কটিচ্যুতি ঘটে বড় ধরনের আঘাতে। কটি উপরের দিকে সরে যাওয়ার দরুন পা খাটো হয়ে গেছে বলে মনে হয় (43 নং ছবি)। কটিচ্যুতি ঘটেছে, না-কি ঊর্বাস্থির (উরুর হাড়) গলা ভেঙ্গেছে তা সঠিকভাবে সনাক্ত করা চিকিৎসক ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়, কেননা দুটির লক্ষণই অভিন্ন। চ্যুতির ক্ষেত্রে পা ভেতরের দিকে ঘুরে যায়। কিন্তু, ঊর্বাস্থির গলাভঙ্গে পা ঘুরে বাইরের দিকে এবং চ্যুতির তুলনায় কটিসন্ধির বিচলন আরও সীমিত হয়ে থাকে।
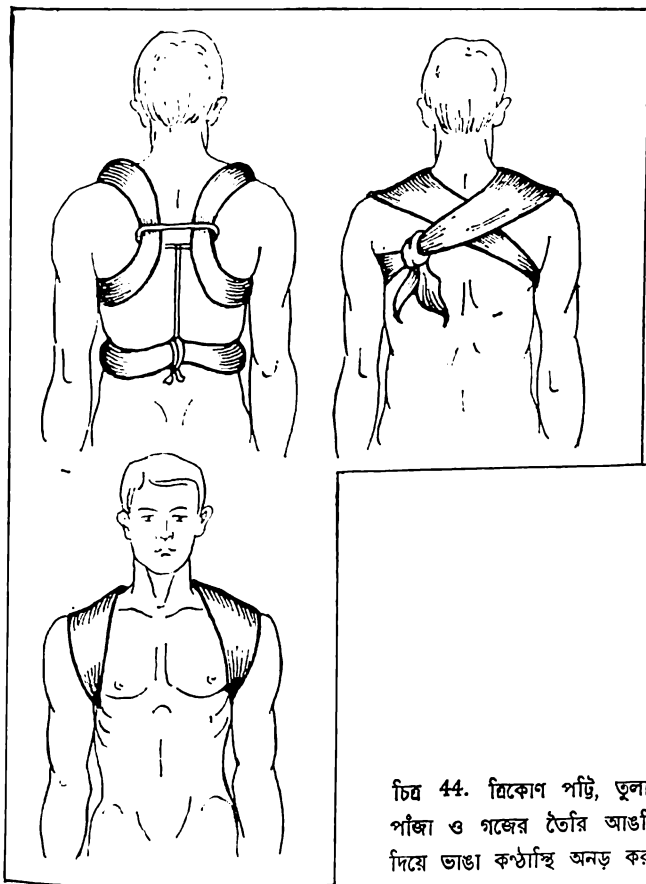
চিত্র 44. ত্রিকোণ পট্টি, তুলার পাঁজা ও গজের তৈরি আঙটি দিয়ে ভাঙা কণ্ঠাস্থি অনড় করা

পা অনড় করে আহতকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠান প্রয়োজন।

হাঁটুচ্যুতি দৈবাৎ ঘটে। পায়ের অক্ষের সঙ্গে কোনাকুনিভাবে হাঁটুর টোপর সহ বেওনেটের মতো ধারাল একটি প্রকট বিকৃতি থেকে এগুলি সনাক্ত করা যায়। কোমল কোষকলা বিধ্বস্ত ও রক্তনালী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুন সন্ধির চারদিকে স্ফীতি ও রক্তক্ষরণ দেখা দেয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা। বুড়ো আঙুল থেকে কুঁচকি পর্যন্ত একটি বন্ধফলক বেঁধে আহতকে হাসপাতালে পাঠান।

কণ্ঠাস্থিভঙ্গ ঘটে হাড়ের উপর সরাসরি আঘাতে কিংবা পার্শ্বাভিমুখে পড়ে গেলে। ভঙ্গস্থলে দেখা দেয় ব্যথা, টুকরোগুলির স্থানচ্যুতির জন্য বিকৃতি, ও রক্তপাত। আঙুল বুলিয়ে হাড়ের টুকরাগুলির বিচলন ও ভঙ্গের ঘর্ষণ ধরা যায়। হাত নাড়ান অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আহতকে স্থানান্তরের জন্য ভাঙ্গা কণ্ঠাস্থিকে অনড় করা প্রয়োজন। এজন্য গজ ও তুলার পাঁজ দিয়ে আঙটি তৈরি করে কাঁধে লাগিয়ে রবাবের নল দিয়ে পেছনে আঁটকে কণ্ঠাস্থি অনড় করতে হয়।

বেশ মোটা, অন্তত 5 সেণ্টিমিটার পুরু তুলার পাঁজ ও গজের বিনুনি দিয়ে আঙটিগুলি তৈরি করতে হবে যাতে কাঁধের উপর সুষম ও যন্ত্রণাহীন চাপ পড়ে। আঙটির ভেতরটা কাঁধের চেয়ে 2-3 সেণ্টিমিটার চওড়া হওয়া আবশ্যক।

সাময়িকভাবে ভাঙ্গা কণ্ঠাস্থি অনড় করার জন্য ত্রিকোণ আট-পাকের পট্টিও ব্যবহার্য। আহতকে বসিয়ে কাঁধ পেছনে টেনে ত্রিকোণ পট্টি বাঁধতে হয়। বাঁধাগুলিকে আরও পেছনে আনা ও কণ্ঠাস্থির টুকরাগুলিকে টানটান করার জন্য কাঁধের হাড়গুলির মাঝখানে তুলার পাঁজ ও গজের একটি প্যাড লাগান। হাড়গুলি অনড় কবার পর বাহুকে একটি ফাঁসে (ত্রিকোণ পট্টির সাহায্যে) ঝুলান।

কণ্ঠাস্থিভঙ্গে প্রায়ই ডেসল্ট পট্টি লাগান হয়। কাঁধগুলি পেছনে টেনে কিছুটা ঘনিষ্ঠ করে বগলে কিড্‌নির আকারের একটি তুলার পাঁজার পট্টি রেখে কনুই সমকোণে ভাঁজ করুন। বাহুকে এই অবস্থানে রেখে ধড়ের সঙ্গে পট্টি বাঁধুন। প্রথমে ধড় ও কাঁধকে কয়েক পাক দিয়ে দক্ষিণাবর্তে পট্টি লাগান। তারপর পট্টি সুস্থ দিকের বগলের তলা দিয়ে বুক পার করে আহত কাঁধের উপর দিয়ে পেছনে নামিয়ে স্কন্ধাস্থির উপর দিয়ে কনুই-সন্ধিতে এনে পেছন থেকে সামনে বাঁধুন। অতঃপর পট্টিটি পুরোবাহুর উপর দিয়ে ও বগলের তলা দিয়ে পিঠে এনে কোনাকুনিভাবে উপরের দিকে পিঠ পার করে আহত কাঁধে এনে কাঁধ বরাবর বগলের নিচ দিয়ে পিঠে আনুন। কয়েক বার পাক দিন।

ভাঙ্গা কণ্ঠাস্থিকে 45 নং ছবিতে দেখান লাঠির সাহায্যে সাময়িকভাবে আটকান যেতে পারে। বাহুগুলি কনুইতে ভাঁজ করে পেছনে টেনে পিঠের উপর লাঠির দুই প্রান্ত আটকে বাহুদুটিকে স্থির অবস্থায় রাখা
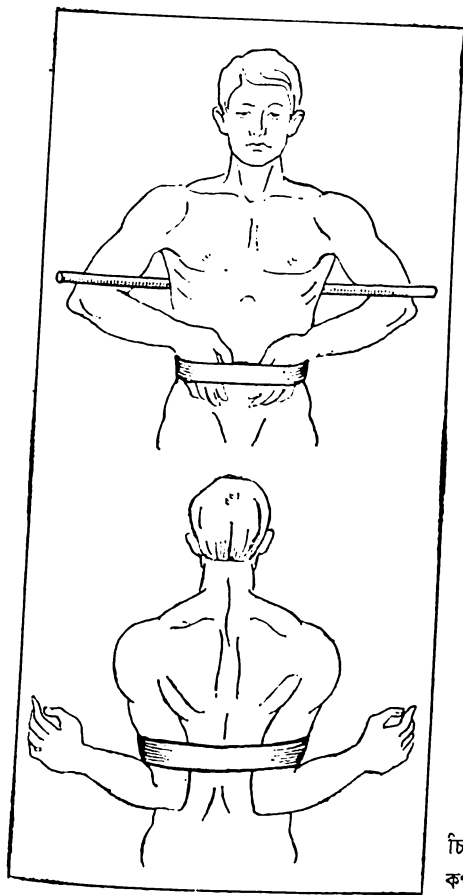
চিত্র 45. লাঠির সাহায্যে ভাঙা কণ্ঠাস্থি অনড় করা

যায়। কণ্ঠাস্থির নিচে কয়েকটি প্রধান রক্তনালীর অবস্থান ও সেগুলি আহত হওয়ার আশঙ্কার কথা মনে রেখে বেশি চাপ না দিয়েই উপরোক্ত কাজগুলি করা প্রয়োজন।

বাহবাস্থির (ঊর্ধ্বাহু) বদ্ধভঙ্গ ওই অস্থির বিভিন্ন অংশে ঘটতে পারে। এতে সক্রিয়ভাবে কাঁধ নাড়ান অসম্ভব হয়ে পড়ে ও প্রচণ্ড ব্যথা বোধ হয়।

বাহবাস্থি মাঝখানে ভাঙ্গলে বিকৃতিটি সহজেই চোখে পড়ে এবং

খন্ডগুলি স্থানচ্যুত হওয়ায় বাহু খাটো দেখায়। ভঙ্গস্থলে বাহু পুরু হয়ে ওঠে, সেখানে অস্বাভাবিক বিচলন দেখা যায় এবং অস্থিখণ্ডের ঘর্ষণ শোনা যায়।

ঘর্ষণ পরীক্ষার চেষ্টা ও সেজন্য হাত নাড়াচাড়া খুবই বিপজ্জনক এবং ক্ষতিকর।

প্রাথমিক চিকিৎসা। ভঙ্গ সন্দেহে ত্রিকোণ বা রোলার পট্টির সাহায্যে বন্ধফলক বা অনড় করার পট্টি বাঁধা প্রয়োজন। বাহুভঙ্গে কাঁধ, কনুই ও কব্জি — এই তিনটি সন্ধি অনড় করা আবশ্যক।

অস্থিভঙ্গের প্রাথমিক চিকিৎসায় আহত অস্থির টুকরোগুলি অনড় করাই আসলে মূল বিষয়। এজন্য বন্ধফলক বহুলব্যবহৃত। সহজলভ্য যে কোন জিনিস — প্লাইউড, তক্তা, ধাতু-তার (জাল বা মইয়ের মতো তৈরি) ইত্যাদি দিয়ে এগুলি বানান যায়। ভঙ্গস্থলের দু'দিকের দুটি সন্ধিকে অনড় করার জন্য বন্ধফলক ব্যবহৃত হয় (ভঙ্গস্থলের উপরে ও নিচে)। হাড় যেখানে উঁচু হয়ে থাকে সেখানে বন্ধফলকের নিচে তুলার পাঁজ বা কাপড় দিতে হয়। বন্ধফলকটি তুলার পাঁজে ঢেকে তা রোলার পট্টি দিয়ে মোড়া প্রয়োজন। এতে ভঙ্গস্থলের উপর চাপ কম পড়ে। তারপর সেটা আহত হাতে বাঁধুন।

বাহুভঙ্গের জন্য ব্যবহার্য: কার্ডবোর্ডের টুকরো, লাঠি বা কোন গাছের ডাল। কিছুই না পাওয়া গেলে ত্রিকোণ পট্টি দিয়ে হাত ঝুলিয়ে বগলে তুলার পাঁজার বল দিয়ে ধড়ের সঙ্গে পট্টি বাঁধা উচিত।

আহতকে স্থানান্তরে ভাঙ্গা বাহু অনড় করার জন্য সম্ভব হলে ক্রামার বন্ধফলকই (46 নং ছবি) সর্বোত্তম। বন্ধফলকটি প্রথমে সুস্থ হাতের আদলে তৈরি করে নিতে হয়। পুরোবাহুর সমান দৈর্ঘ্যের ও হাতটি বন্ধফলকের এক প্রান্তে রেখে ফলকটি সমকোণে ভাঁজ করুন, যাতে বন্ধফলকের চাপ থেকে কনুইটি বাঁচানোর জন্য ওই কোণে একটা নরম প্যাড লাগানোর মতো যথেষ্ট জায়গা থাকে। তারপর বাহুর মাপ নিন ও তাতে 2-3 সেণ্টিমিটার যোগ করুন, যাতে তুলার পাঁজ ও গজ প্যাডিংয়ের স্থানসঙ্কুলান হয়। কাঁধের সংলগ্ন বন্ধফলকটিকে সতর্কভাবে তৈরি করা প্রয়োজন: 115 ডিগ্রিতে বেঁকিয়ে ও অক্ষ বরাবর পাক দিয়ে, যাতে তা কাঁধের সঙ্গে ভালভাবে সেঁটে বসে, কাঁধের হাড়গুলির মধ্যেকার জায়গার আকৃতি পায় ও আহত হাত থেকে উল্টোদিকের কাঁধের হাড়ে
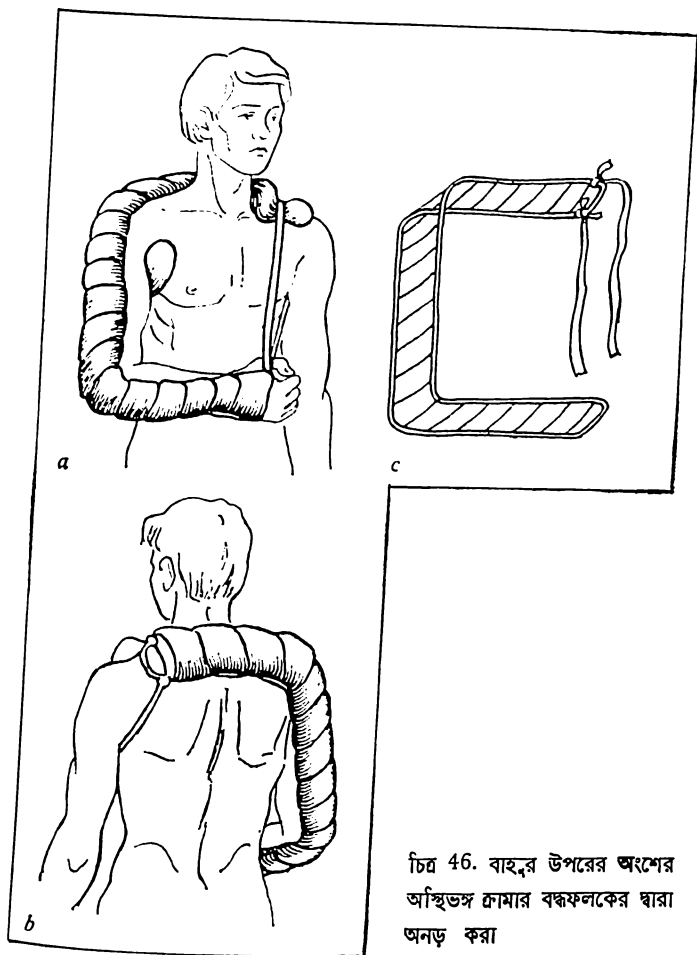
চিত্র 46. বাহুর উপরের অংশের অস্থিভঙ্গ ক্রামার বন্ধফলকের দ্বারা অনড় করা

গিয়ে শেষ হয়। কাঁধের উপরের ও পুরোবাহুর ঠেক্‌নো হিসাবে ব্যবহার্য বন্ধফলকের অংশগুলিতে খাঁজ বানাতে হবে তির্যক তারগুলিকে পর্যায়ক্রমে বেঁকিয়ে।

টেবিলের কিনারে রেখে বন্ধফলক বাঁকান সুবিধাজনক। ফলকটি তৈরি হওয়ার পর কাঁধ একপাশে সামান্য হেলিয়ে তুলার পাঁজ ও গজ দিয়ে তৈরি কিড্‌নি আকারের একটি প্যাড ($15\times10\times5$সে. মি.) বগলের
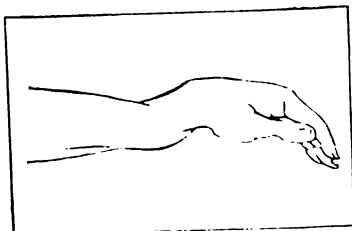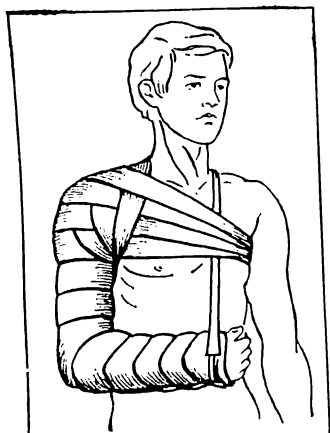
চিত্র 47. বাহুর উপরের অংশের অস্থিভঙ্গ অনড় করা

চিত্র 48. র‍্যাডিয়াসভঙ্গে প্রোবাহুর বিকৃতি

নিচে রাখুন। তৈরি ফলকটি (তখনো প্যাড দিয়ে না ঢাকা হলে) তুলার পাঁজ ও গজ দিয়ে মুড়ে রোলার পট্টি দিয়ে শক্ত করুন। হাত কনুইতে সমকোণে ভাঁজ করে ছাঁচে তৈরি বদ্ধফলকে রাখুন। ফলকের যে-প্রান্তটি পিঠে লেগে আছে তাতে দু' টুকরো পট্টি বাঁধুন। মুক্ত পট্টির সামনের টুকরোটি সুস্থ কাঁধে সরিয়ে আনুন এবং সামনে বদ্ধফলকের নিচের প্রান্তের ভেতরে বাঁধুন। পেছনের টুকরোটি বগলের নিচে এনে বাইরের প্রান্তের সঙ্গে আটকান। ঘাড় ও কাঁধে তুলার পাঁজ ও গজের প্যাড লাগান। হাতকে কনুইতে সমকোণে ভাঁজ করে রাখার জন্য পট্টির টুকরোগুলি শক্ত করে বাঁধা প্রয়োজন।

তারপর বদ্ধফলকটিকে হাতের সঙ্গে আগাগোড়া পট্টি দিয়ে ঢেকে, কাঁধে শক্ত করে বাঁধুন। বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে সুস্থ দিকে আট-পাকের পেঁচে পট্টি লাগানোই নিয়ম। যাতে পিছলে না যায় সেজন্য কাঁধের উপর দিয়ে সামনে ও ধড় পেঁচিয়ে কয়েকটি পাক কষে বদ্ধফলকের উপরের প্রান্তটি আহত লোকটির মাথায় পেছন পর্যন্ত (47 নং ছবি) শক্ত করে আটকাতে হয়।

পুরোবাহুভঙ্গ। পুরোবাহুর হাড়দুটি — র‍্যাডিয়াস ও আলনা — নানাভাবে ভাঙ্গা সম্ভব: যে কোনটি পৃথকভাবে ভাঙ্গা, কিম্বা দুটিরই এক বা একাধিক স্থানে ভাঙ্গা। কব্জিতে র‍্যাডিয়সভঙ্গ প্রায়ই ঘটে। হাত দিয়ে হ্যাণ্ডেল মেরে গাড়ির ইঞ্জিন চালানোর চেষ্টায় তা ছেড়ে দেয়ার সময়,

সেই হ্যাণ্ডেলের আঘাতে গাড়িচালকদের মধ্যে এই অস্থিভঙ্গ হামেশাই ঘটে থাকে। এটা এড়ানোর জন্য বুড়ো আঙুল পাশে না রেখে সব আঙুল দিয়ে হ্যাণ্ডেলটি একপাশে চেপে ধরা উচিত।

র‍্যাডিয়াস ভঙ্গের লক্ষণগুলি খুবই বিশিষ্ট ধরনের: হাড়ের নিচের অংশে ব্যথা, টুকরোগুলির স্থানচ্যুতির জন্য পুরোবাহুর বেওনেটের মতো বিকৃতি (48 নং ছবি)।

ভাঙ্গা পুরোবাহুর দুটি সন্ধি — কনুই ও কব্জি নিশ্চল করা প্রয়োজন। এজন্য ক্রামারের বদ্ধফলকই সর্বোত্তম। আহত হাত কনুইতে সমকোণে ভাঁজ করে করতালু ধড়ের দিকে রেখে পুরোবাহু ঘুরান। ক্রামার বদ্ধফলক সমকোণে বাঁকান, যাতে এতে পুরোবাহ ও কব্জি স্বচ্ছন্দে রাখা চলে। বদ্ধফলকের তির্যক দণ্ডগুলি বেঁকিয়ে খাঁজ তৈরি করুন, যাতে পুরোবাহুকে সঠিক অবস্থানে আটকে রাখা যায়। তুলার পাঁজার বেশ পুরু একটি বল করতালুর নিচে রেখে পট্টি দিয়ে হাতের সঙ্গে বাঁধুন। আঙুলের ডগা থেকে বাহুর উপরের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বদ্ধফলক লাগিয়ে পট্টি বাঁধুন ও ত্রিকোণ পট্টি দিয়ে ঝুলান। তারের বদ্ধফলক না পাওয়া গেলে কার্ডবোর্ড বা প্লাইউডের টুকরো লাগানোও চলে। কার্ডবোর্ড জলে ভিজিয়ে বাহু ও পুরোবাহুর আকার অনুযায়ী বেঁকিয়ে পট্টি দিয়ে আঁটকান।

নমুনাসই (টিপিক্যাল) জায়গায় র‍্যাডিয়াস ভাঙ্গলে আঙুলের ডগা থেকে কনুই অবধি কার্ডবোর্ডের বদ্ধফলক লাগিয়ে পুরোবাহু অনড় করা আবশ্যক। হাত ও কব্জি স্বাভাবিক অবস্থানে রেখে করতালুর নিচে তুলার পাঁজার বল রাখুন।

হস্তভঙ্গে হাতের হাড় ও সন্ধির ক্ষতির দরুন জটিল হয়ে ওঠে বলে সেগুলি অনড় করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত হাতের বহুবিধ ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী স্মরণীয়। স্থির অবস্থায় কব্জি সামান্য কিছুটা পেছনে বাঁকান এবং বুড়ো আঙুল একপাশে ও অন্যান্য আঙুলগুলি অর্ধনমিত থাকে। বুড়ো আঙুল অন্যসব আঙুলের উল্টোদিকে থাকে ও হাতকে আঁকড়ে ধরার সামর্থ্য যোগায়। হাত অনড় করার সময় আঙুলের এই কার্যকর অবস্থানটি অটুট রাখা আবশ্যক।

উরুভঙ্গ। উরু-অস্থি দেহের বৃহত্তম অস্থি। অস্থিটি পুরো একপ্রস্ত পেশীতে বেষ্টিত যার মধ্যে দিয়ে অনেকগুলি প্রধান রক্তনালী ও স্নায়ু

বিস্তৃত। ঊরু-অস্থিভঙ্গে আশপাশের কোমল কোষকলার অনেকটাও বিধ্বস্ত হয়।

রক্তনালীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণ ঘটে। পেশীগুলি ছিন্ন হওয়ার ফলে তৈরি গর্তে রক্ত জমে। আভ্যন্তরীণ রক্তপাত ও আহত স্নায়ুপ্রান্তের প্রবল উত্তেজনার দরুন শরীরে তীব্র ব্যথাবোধ থেকে ঘাত অর্থাৎ অভিঘাত (শক) পর্যন্ত দেখা দেয়।

ঊরুভঙ্গ ঊরুতে যান্ত্রিক শক্তির আঘাতেই ঘটে, যেমন: কোন যান বা সংঘর্ষের আঘাত, উঁচু থেকে পড়া অথবা ভারি জিনিষে পায়ে প্রবল আঘাত।

আহত ব্যক্তি ভঙ্গস্থলে প্রচণ্ড ব্যথাবোধের কথা বলে এবং আহত পায়ে চাপ সহ্য করতে পারে না। বিকৃতি, অস্বাভাবিক বিচলন সহ আঘাতের জায়গায় ঘসা দিলে অস্থিখণ্ডগুলির ঘর্ষণ অনুভব করা যায়। অস্থিখণ্ডগুলির স্থানচ্যুতির ধরন অনুসারে ঊরু খাটো হতে ও কোনাকুনি বেঁকে যেতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। আহতকে অবেদনিক ঔষধ দেয়া ও পা অনড় করা প্রয়োজন। অনড় করলে কোষকলার বাড়তি ক্ষতির সম্ভাবনা কমে এবং তাতে রোগী স্থানান্তরের আনুষঙ্গিক মারাত্মক উপসর্গ, বিশেষত যা প্রায়ই ঘটে সেই অভিঘাত এড়ান যায়। অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক অনড়করণ রক্তনালীগুলির নিষ্পেশন কমায়, আহত এলাকায় রক্তসঞ্চালন বাড়ায় এবং ফলত সংক্রমণের বিরুদ্ধে আহত কোষকলার প্রতিরোধ বৃদ্ধি পায়।
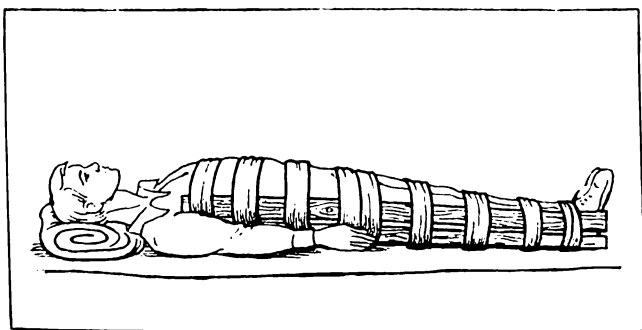
চিত্র 49. বদ্ধফলক দ্বারা উরুভঙ্গ অনড় করা

অনড় অবস্থায় থাকলে জমাট রক্তখণ্ডগুলি অটুট থাকে, যা আহত রক্তনালীগুলি আটকে রাখে ও পরোক্ষ রক্তপাত থামায়।

দুর্ঘটনাস্থলে পাওয়া সামগ্রীগুলি প্রায়ই ঊরুভঙ্গ অনড় করার জন্য ব্যবহৃত হয় (49 নং ছবি)।

লভ্য সামগ্রী থেকে দুটি বদ্ধফলক তৈরি করুন: ভেতরের একটি, কুঁচকি থেকে গোঁড়ালি পর্যন্ত আর বাইরের লম্বা ফলকটি বগল থেকে গোঁড়ালি অবধি। দুটি বদ্ধফলকই পা ও ধড়ের সঙ্গে বেল্ট বা কাপড় থেকে ছিঁড়ে নেওয়া ফিতা দিয়ে বাঁধা যায়।

ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, বদ্ধফলকের জন্য কিছুই না পাওয়া গেলে ভাঙ্গা পাটি সুস্থ পায়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলা উচিত।

পা-ভাঙ্গা নানা ধরনের ও নানা গুরুত্বের হতে পারে। উভয় অস্থিই মাঝখানে ও পায়ের নিচের দিকে তৃতীয়াংশে ভেঙ্গে যাওয়া সবচেয়ে মারত্মক।

একই পর্যায়ে জঙ্ঘাস্থি (টিবিয়া) ভঙ্গও কম মারাত্মক নয়।

গোঁড়ালির হাড়ের বিচ্ছিন্ন বদ্ধভঙ্গ ততটা মারাত্মক নয়।

পায়ের দুটি হাড় মাঝামাঝি ভেঙ্গে যাওয়ার লক্ষণ: তীব্র ব্যথা, অঙ্গবিকৃতি, স্থূলত্ব, মোচড়ান, অস্বাভাবিক সচলতা, ভঙ্গস্থলে খরখর শব্দ। টিবিয়ার সামনের চূড়ায় প্রায়ই টুকরোগুলি উঁচিয়ে থাকতে দেখা যায়।

এককভাবে টিবিয়া-ভঙ্গে একই লক্ষণ দেখা দিলেও বিকৃতি ততটা প্রকটিত হয় না। কেননা, অটুট ফিবুলা কিছুটা 'আভ্যন্তরীণ বদ্ধফলক' হিসাবে কাজ করে ও আহত টিবিয়ার টুকরোগুলির অতিরিক্ত স্থানচ্যুতি আটকায়। টিবিয়ার সামনা যেহেতু কেবল চামড়ায় ঢাকা থাকে ও ভেঙ্গে যাওয়া হাড়ের ধারাল টুকরোয় সহজেই ছিড়ে যায় সেজন্য অস্থিভঙ্গ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

গোঁড়ালির অস্থিভঙ্গে সেখানকার অস্থির বাইরের বা ভেতরের দিকের এলাকায় যন্ত্রণা হতে থাকে, ফুলে ওঠে, রক্তপাত হয়, গোঁড়ালির গাঁট নাড়ান কঠিন হয়ে পড়ে ও পায়ের উপর খাড়া হওয়া যায় না।

প্রাথমিক চিকিৎসা। বদ্ধফলক লাগান ও বেদনাহর ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন।

পদকুর্চাস্থিভঙ্গ (মেটাটার্সাল অস্থিসমূহ) ঘটে পায়ে ভারি জিনিস পড়লে কিংবা পায়ের উপর দিয়ে গাড়ির চাকা ইত্যাদি গড়িয়ে গেলে।

এই অস্থিভঙ্গের লক্ষণ: পায়ের পাতার উপরে ব্যথা, দ্রুত ফুলে ওঠা, রক্তপাত, পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে চলায় অসামর্থ্য।

প্রাথমিক চিকিৎসা। পায়ের পাতা ও গোঁড়ালির সন্ধি অনড় করা প্রয়োজন। এই ধরনের উপকরণ না পাওয়া গেলে ত্রিকোণ পট্টি বেঁধেও পায়ের পাতা অনড় করা চলে।

বৃহৎ অস্থিসন্ধিগুলির (শ্রোণী, হাঁটু, কাঁধ ও কনুই) ক্ষত খুবই মারাত্মক এবং তা প্রায়ই পঙ্গুত্ব ঘটাতে ও আহত ব্যক্তির জীবনের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। অস্থিসন্ধিগুলির সান্ধিক তলের ব্যাপক ক্ষতিজনিত আঘাত সংক্রমণের উপসর্গ সহ খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে।

আহত অস্থিসন্ধির লক্ষণ: চলাচলের সময় ব্যথাবোধ, সন্ধি-ঘেরা স্ফীতি, উচ্চাবচের মসৃণতা, নাড়ানোর সুস্পষ্ট সীমিত সামর্থ্য।

প্রাথমিক চিকিৎসা। ক্ষতে নির্বীজিত পট্টি লাগান, বেদনাহর ঔষধ সেবন, সন্ধি অনড় করা।

বৈদ্যুতিক আঘাত

উচ্চশক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ বা আবহজাত বিদ্যুৎ (বজ্রপাত) থেকে বৈদ্যুতিক আঘাত লাগে। বিদ্যুৎপ্রবাহ শরীরে সাধারণ বিঘ্ন, উচ্চতর স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎরক্তসংবহন ও শ্বসনতন্ত্রের বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলত, মধ্যচ্ছদা ও হৃৎপেশীয় খিঁচুনি, অস্থিলগ্ন পেশীয় আক্ষেপ দেখা দেয়, রোগী মূর্ছা যায়।

কোষকলার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ অতিক্রমের সময় উৎপন্ন তাপের দরুন বিদ্যুতের প্রবেশ ও নির্গমন পথে গভীর দাহ সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো বিদ্যুৎ চামড়ায় চিহ্ন রেখে যায়। তাপ, আলো ও যান্ত্রিক প্রভাবের মাধ্যমে বিদ্যুৎপ্রবাহে কোষকলার ব্যাপক ও গভীর ধ্বংস ঘটে।

বৈদ্যুতিক আঘাতের সঙ্গে প্রায়ই অভিঘাত (শক্) সংশ্লিষ্ট থাকে: হৃৎপিণ্ড, শ্বসন ও মস্তিষ্কের প্রাথমিক অসাড়তার দরুন মৃত্যু (তাড়িত-মৃত্যু) ঘটে।

বৈদ্যুতিক আঘাতজনিত **স্তিমিত সজীবতার লক্ষণ হিসাবে** দেখা

দেয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর প্রত্যঙ্গগুলির কার্যকলাপে চূড়ান্ত বিঘ্ন ও দুর্বলতা এবং প্রাণচিহ্নের প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি।

ভিজে পোশাক, পাদুকা ও ভিজে হাতের দরুন বিদ্যুতের পরিবাহিতা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে এমতাবস্থায় মানুষের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের আঘাত তীব্রতর হয়। এই পরিস্থিতিতে এমনকি 220 ভোল্ট বিদ্যুতের আঘাতও মারাত্মক হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। আহত ব্যক্তি যদি তখনো বিদ্যুতের প্রভাবাধীন থাকে (বিদ্যুতের তার গায়ে লেগে রয়েছে বা খিঁচুনি-ধরা হাতে খোলা তার জড়িয়ে আছে) তাহলে সুইচ বন্ধ করে, ফিউজ খুলে ফেলে, সকেট থেকে প্লাগ সরিয়ে বা বিদ্যুৎ-অপরিবাহী কিছু দিয়ে আহতের শরীর থেকে তারটি সরিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করা প্রয়োজন। প্রাথমিক চিকিৎসক শুকনো ও আলাদা রাখা কিছুর উপর, বোর্ড বা রবারের মাদুরে দাঁড়াবেন।

আহতকে বিদ্যুৎপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম শ্বসন শুরু করা এবং বাহ্যিক হৃৎমর্দন প্রয়োজন। আহতকে পুনরুজ্জীবিত করার যাবতীয় প্রচেষ্টা অবিরাম ও অনেকক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে।

মৃত্যুর সুস্পষ্ট লক্ষণ (শবচিহ্ন ও শবকাঠিন্য) দেখা দিলেই কেবল পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হবে।

আহতের জ্ঞান ফিরলে তাকে যথেষ্ট জলীয় পদার্থ পান করান এবং দগ্ধস্থল নির্বীজিত কম্বলে ঢেকে হাসপাতাল পাঠান উচিত।

দহন ও বাষ্পদাহ

পোড়া ও ছেঁকা হল তাপ, বিদ্যুৎ বা আগ্রাসী তরলের (অ্যাসিড ও ক্ষার) স্পর্শজনিত আঘাত। হেতুগতভাবে তাপ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক পদার্থ ও বিকিরণ জনিত দহনগুলি পৃথক করা যায়।

তাপীয় দহন ঘটে খোলা আগুন, ফুটন্ত জল, গনগনে ধাতু, গলিত প্লাস্টিক, ধুনা, শিলাজতু, পিচ্ ইত্যাদি থেকে।

বৈদ্যুতিক দহনের উৎস হল উচ্চশক্তির বিদ্যুৎবহ খোলা তারের সংস্পর্শ।

রাসায়নিক দহন ঘটে চামড়া বা শ্লৈষ্মিকঝিল্লির উপর বিদাহী

রাসায়নিক, ঘনীভূত অ্যাসিড ও ক্ষারীয় দ্রবণ, আয়োডিন, পটাস পার্মাঙ্গানেট, ফসফরাস ইত্যাদির প্রতিক্রিয়ার ফলে।

তাপীয় দহনে রক্ষামূলক আবরণীরূপী শরীরের চামড়াই প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতির মাত্রা প্রধানত উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবাধীন থাকার ধরন ও সময়ের উপর নির্ভর করে। নরকোষের তাপসহিষ্ণুতার সীমানা কমবেশি 45 ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। চামড়া কোষকলার গভীরে তাপের অনুপ্রবেশ আটকাতে সমর্থ বিধায় এক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন অংশে চামড়ার পুরুত্ব খুবই প্রাসঙ্গিক। দৃষ্টান্ত হিসাবে পিঠ ও কাঁধের তুলনায় মুখ ও হাতের তালুর পাতলা চামড়া প্রায়ই গভীরভাবে পুড়ে যায়।

পোড়া উপরিগত বা গভীর হতে পারে। উপরিগত দহনে চামড়ার কেবল উপরের স্তরগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু চামড়ার উৎপাদক স্তর বা অন্যান্য পুনরুৎপাদক উপাদানগুলি অটুট থাকে।

গভীর দহনে উপঝিল্লি উৎপাদনের যাবতীয় উৎস ধ্বংস হয়ে যায়, 6-7 সেণ্টিমিটারের বেশি চওড়া যে-ক্ষত সৃষ্টি হয় তাতে আপনা থেকে উপঝিল্লি জন্মাতে পারেনা ও চামড়া সংরোপণ (গ্রাফটিং) অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে দহনের চারটি মাত্রা (অন্যান্য দেশে ছ'টি) পৃথক করা হয়।

প্রথম মাত্রায় দহনে উপঝিল্লিকোষ সহ চামড়ার উপরের স্তরটির মাঝারি ধরনের ক্ষতি ঘটে। চামড়া লাল হয়ে ওঠে, ফুলে যায় ও ব্যথাবোধ হয়। চিকিৎসা ছাড়াই লক্ষণগুলি 2-3 দিনের মধ্যে লোপ পায় এবং অল্পস্বল্প চুলকানি ও ত্বকমোচন ব্যতিরেকে পোড়ার আর কোনই চিহ্ন থাকে না।

দ্বিতীয় মাত্রার দহনে পোড়ার সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুক্ষণ পরে লালচে চামড়ার উপর হলদে তরলপূর্ণ ফোস্কা পড়ে। এগুলি ফেটে গেলে উজ্জ্বল লাল ভিত সহ একটি যন্ত্রণাকর ক্ষত দেখা যায়।

পোড়ার কোন সংক্রমণ না ঘটলে একটির আধেয় 4-5 দিনের মধ্যে গলে যায় বা ফোস্কাগুলি ফেটে শুকিয়ে ওঠে। উপচর্মে, চামড়ার উপরের স্তরে কোন দাগ না রেখেই জায়গাগুলি ভরাট হয়ে যায়।

তৃতীয় মাত্রার দহনের লক্ষণ হল কোষকলার গভীরতর অবক্ষয়, স্পষ্টতর ক্ষতচিহ্ন, দগ্ধ খোসা, যথেষ্ট পুরু হালকা-বাদামী থেকে কাল রঙের আস্তর গঠন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তৃতীয় মাত্রার দহনের দুটি ভাগ স্বীকৃত: 3-A ও 3-B। নীতিগতভাবে তা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, কোন ক্ষতচিহ্ন ছাড়া ক্ষতনিরাময়ের উপকরণের উৎস উপঝিল্লির উপাদানগুলি 3-A মাত্রার দহনে অটুট থেকে যায়। কিন্ত 3-B মাত্রার দহনে যাবতীয় উৎপাদক ত্বকস্তর পুরোপুরি বিনষ্ট হয়।

চতুর্থ মাত্রার দহনে (সোভিয়েত শ্রেণীবিভাগে) গভীরতর কোষকলা অর্থাৎ ত্বকনিম্ন চর্বিকলা, পেশী ও হাড়গুলি ভস্মীভূত ও রোগগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়-A মাত্রার দহনগুলি হল উপরিগত আর তৃতীয়-B ও চতুর্থ মাত্রার দহনগুলি গভীরতর। দহনের প্রকটতা আসলে এর গভীরতা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিসরের উপর নির্ভরশীল।

সারা শরীরের অর্ধেকের বেশি উপরিগত দহনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাধারণত তাতে কোন মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে না। কিন্তু শরীরের 10-15 ভাগ গভীরভাবে পুড়ে গেলে দাহপীড়ার আক্রমণ সহ মারাত্মক উপসর্গ দেখা দেয় এবং শরীরের যাবতীয় তন্ত্র ও প্রত্যঙ্গগুলি সংশ্লিষ্ট বিধায় এক্ষেত্রে চিকিৎসা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে।

দাহপীড়ার কয়েকটি কালপর্ব রয়েছে। প্রথমটি, একেবারে গোড়ার দিকের পর্যায়টি — দাহ-অভিঘাত। এটি স্থায়ী হয় 1-2 দিন, এতে কোন নিদানিক ছবি সুপরিস্ফুট হয় না আর লক্ষণও থাকে খুবই কম: সাধারণ দুর্বলতা, ক্লান্তি, নিরোধ ও নাড়ীর দ্রুতগতি। বিশেষ মারাত্মক পরিস্থিতিতে রক্ত কমে যেতে পারে, প্রস্রাবের পরিমাণে যথেষ্ট হ্রাস পায়, প্রস্রাবের রঙ গাড় ও গন্ধ তীব্র হয়ে ওঠে। দাহ-অভিঘাতের সম্ভাবনা পোড়ার পরিসর থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।

দাহের পরিসর দ্রুত নির্ধারণের সরলতম প্রণালী হল 9-এর নিয়ম ও করতলের নিয়ম। জানা আছে যে, পূর্ণ-বয়স্কদের ক্ষেত্রে মাথা ও ঘাড়ের এলাকার আয়তন সারা দেহতলের 9 শতাংশ; পাগুলি 18 শতাংশ (9×2), বুকের ও ধড়ের সামনা 18 শতাংশ, ধড়ের পেছন 18 শতাংশ, মূলাধার 1 শতাংশ। এই হিসাবের মাধ্যমে পোড়া জায়গার আয়তনটি সঠিকভাবে জানা সম্ভব। অনুপূরক হিসাবে করতলের নিয়মও

প্রযোজ্য। করতলের সাহায্যে পোড়া এলাকা মেপে তার আয়তন জানা সম্ভব।

প্রাথমিক চিকিৎসা। ক্ষতিকর হেতুর (আগুন, গরম জল, বাষ্প, গলিত আঠাল পদার্থ, বিদ্যুৎ, বিদাহী তরল) কাজ তৎক্ষণাৎ বন্ধ করা প্রয়োজন।

কাপড়ে আগুন লাগলে দৌড়াবেন না। কারণ, তখন টেনে-আনা বাতাস আগুন নিভানোর বদলে তাতে আরও ইন্ধন যোগায় এবং শরীর খাড়া থাকলে দহন মুখ ও চুলে ছড়িয়ে পড়ে ও গরম বাতাসে শ্বাস নেওয়ার দরুন শ্বসনতন্ত্রের ক্ষতি ঘটে। এক্ষেত্রে মাটিতে চিৎ-হয়ে শুয়ে পড়া, জ্বলন্ত পোশাক সরান বা আগুন নিভানোর চেষ্টা করা উচিত। পোড়া জায়গা শক্তভাবে কম্বল, ওভারকোট, ত্রিপল বা বালু, মাটি কিংবা বরফ দিয়ে ঢেকে ফেলা দরকার, যাতে পোড়া অংশে বাতাস না ঢুকে। আর তা সম্ভব না হলে আহত ব্যক্তি অবশ্যই পোড়া জায়গা মাটিতে শক্ত করে চেপে ধরবে।

শরীরে সেঁটে থাকা কাপড়ের টুকরাগুলি টেনে না তুলে প্রয়োজনমতো ওগুলির চারপাশ কেটে ফেলা প্রয়োজন। অবশিষ্ট পোশাক জ্বলন্ত বা ভিজে না হলে যথাস্থানে রাখাই উচিত।

অদ্ভুত হলেও সত্যি, পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসায় আজ ও সর্বত্র সেইসব অনুপযোগী ব্যবস্থাগুলিই চালু রয়েছে: পোড়ায় তেল মাখান, শর্করা জাতীয় জিনিস ছড়ান, প্রস্রাব বা অ্যানিলাইন রঞ্জকে মুছে ফেলা ইত্যাদি।

প্রত্যেকেরই এই প্রাথমিক চিকিৎসাটি জানা প্রয়োজন। এগুলি দ্রুত ও শুদ্ধভাবে প্রয়োগ করার উপরই রোগীর বাঁচা-মরা নির্ভর করে।

বিশেষ লক্ষণ দেখা গেলেই শুধু পুনরুজ্জীবনের (হৃৎমর্দন, কৃত্রিম শ্বসন) উদ্যোগ গ্রহণীয়।

হৃৎপিন্ড নিস্পন্দ ও শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেলে যথাসম্ভব দ্রুত পোড়া এলাকা চিহ্নিত ও পরিচর্যা করা প্রয়োজন।

পোড়া এলাকা ছোট হলে, অর্থাৎ যথেষ্ট এলাকা পুড়ে না গেলে, তড়িতাঘাতে বা আনুষঙ্গিক যান্ত্রিক আঘাতে যদি হৃৎপিন্ড থেমে যায়, তাহলেই শুধু পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চালান প্রয়োজন।

যন্ত্রণা কমান ও কোষকলার গভীরে দহনের বিস্তার বন্ধের জন্য

পোড়া জায়গায় 15-20 মিনিট ঠাণ্ঠা জলের প্রবাহ বা তুষারশীতল জলে ভেজান তোয়ালে চাপা দিয়ে সেটা ঠাণ্ডা করা উচিত। পোড়া জায়গার পরিমাণ শরীরের 15-20 শতাংশের বেশি হলে হৃৎপিণ্ড-নিলয়ের সম্ভাব্য কম্পনের প্রেক্ষিতে শরীরে বেশি ঠাণ্ডা লাগান খুবই বিপজ্জনক। পোড়া জায়গা শুকনো, নির্বীজিত পট্টি দিয়ে ঢাকা উচিত। শরীর অনেকটা পুড়ে গেলে আহতকে শুধু একটি পরিষ্কার কাপড়ে পেঁচিয়ে রাখাই যথেষ্ট। মুখের ক্ষতিগ্রস্ত চামড়ার উপর ভাসেলিন তেল (পেট্রলিয়াম জেলি) লাগিয়ে মুখ খোলা রাখা প্রয়োজন। সম্ভব হলে ত্বকনিম্নে বেদনাহর (প্রমেডোল) ইনজেকসন দিন। শীতল আবহাওয়ায় আহতকে গরম রাখা দরকার।

তৃষ্ণার্ত রোগীকে লবণ ও ক্ষার মিশ্রের পানীয় দেয়া উচিত (এক লিটার জলে চায়ের চামচে এক চামচ সাধারণ লবণ ও অর্ধেক চামচ খাবার সোডা)।

অ্যাসিড বা ক্ষারের রাসায়নিক দহনের ক্ষেত্রে (বিশেষত চোখে) পোড়া জায়গা জল দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে ফেলা উচিত।

আহতকে হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যাপারটি দুর্ঘটনাস্থলেই স্থির করা হয়। উপরিতলের সামান্য এলাকা পুড়লে (10 শতাংশ পর্যন্ত) ও আহতের সাধারণ অবস্থা সন্তোষজনক থাকলে, সে সাহায্য ছাড়া চলতে পারলে ও হাসপাতালের চিকিৎসা নিষ্প্রয়োজন হলে তাকে কাছের দুর্ঘটনা বা প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে অথবা কোন সার্জনের কাছে নেওয়া চলে।

নিম্নোক্ত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন: 1. শরীরের উপরের 10 শতাংশের বেশি জায়গা জুড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার দহন ও গভীর দহনে;

2. শ্বাসপ্রশ্বাসের আনুষঙ্গিক প্রত্যঙ্গ, মুখ ও ঘাড়ের দহনে;

3. শরীরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকার দহনে (কার্যকলাপ ও কান্তিরক্ষার বিচারে), যেমন হাত-পায়ের পাতা, বড় বড় অস্থিসন্ধি, মূলাধার;

4. অন্যান্য ক্ষতের সঙ্গে দহনের সমনবয়ে, যেগুলি হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালী, ফুসফুস, যকৃৎ ও কিডনি ইত্যাদির আনুষঙ্গিক রোগের পটভূমিতে বৃদ্ধি পায়।

হিমক্ষত

দীর্ঘ সময় হিমে অনাবৃত থাকলে হিমক্ষত দেখা দেয়। শরীরের প্রান্তিক অংশগুলি — হাতের ও পায়ের আঙুল, নাক, কান ও গাল শীত থেকে ততটা সুরক্ষিত না থাকায় খুব সহজেই হিমক্ষতে আক্রান্ত হয়। তুষারপাতের সময় হিমক্ষত না হলেও তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রিতে থাকলে, কিংবা ভিজে, ঠান্ডা ও তীব্র বাতাস থাকলে অথবা জুতা ভেজা, শক্ত করে আঁটা ও সেগুলি অনেকক্ষণ পায়ে থাকলে তা ঘটতে পারে।

হিমক্ষত যেসব প্রবণতা থেকে ঘটা সম্ভব তা হল: রক্তক্ষরণের জন্য শরীরের সাধারণ দুর্বলতা, উপোস থাকা, ভিটামিনের অভাব, হৃৎসংবহনতন্ত্রের রোগ ও ক্লান্তি। অবিরাম হিমের প্রভাবে রক্তনালী কোষকলার পুষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে ও সেগুলি আংশিক বা পুরোপুরি সম্প্রসারিত হয় ও পরে সেগুলিতে আক্ষেপ দেখা দেয় এবং ফলত অসাড় হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনের তীব্রতার নিরিখে চার মাত্রার হিমক্ষত সনাক্ত করা যায়।

প্রথম মাত্রার হিমক্ষতের লক্ষণ হল উলটোমুখী রক্তসঞ্চালনের বিঘ্নের দরুন প্রকটিত চামড়ার ক্ষত। চামড়া বিবর্ণ ও অসাড় এবং গরম করার পর নীলচে-লাল, যন্ত্রণাকর হয় ও ফুলে ওঠে। কখনো ত্বকমোচন দেখা দেয়। এইসব রোগপ্রক্রিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই সেরে যায়। কিন্তু, শরীরের হিমাহত অংশটি দীর্ঘকাল হিমসংবেদী হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মাত্রায় আহত অংশে ফোস্কা পড়ে ও সেগুলি চামড়ার উপরে ধোঁয়াটে রঙের তরলে ভরে ওঠে ও শেষে ফোস্কাগুলি লালচে-নীল হয়ে যায়।

তৃতীয় মাত্রার হিমক্ষতে চামড়ার অনেকটা গভীর অবধি পুরোটাই অসাড় হয়ে পড়ে ও হাতে কোষকলা স্পর্শ করলে শক্ত মনে হয়।

চতুর্থ মাত্রার হিমক্ষতে সবগুলি কোমল কোষকলা ও হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসাড় কোষকলা দ্রুত প্রাণ হারায় এবং ক্ষতগুলি নিরাময়ে দীর্ঘ সময় লাগে ও সেখানে মোটা মোটা দাগ থাকে।

প্রাথমিক চিকিৎসা। স্নানপাত্রে 20°-40°C অবধি ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়িয়ে শরীরের হিমাহত অংশ গরম করা প্রয়োজন। চামড়া লাল ও গরম না হওয়া পর্যন্ত এই সঙ্গে আহত এলাকার কিনার ও

কেন্দ্রের দিকে ম্যাসাজ করা দরকার। স্নানপাত্র না থাকলে আহত অংশকে প্রথমে স্পিরিটে ভেজান তুলো দিয়ে ও শেষে পরিষ্কার, শুকনো ফ্ল্যানেল দিয়ে ঘসেও গরম করা যায়।

আহত অংশ বরফ দিয়ে বা নোংরা হাত দিয়ে ঘসা নিষেধ। ক্ষত ও আশপাশের এলাকায় 5 শতাংশ আয়োডিন টিংচার লাগাবেন ও নির্বীজিত পটি দিয়ে ঢেকে রাখবেন।

স্থানীয় এলাকার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধির ব্যবস্থা প্রয়োজন। আহতকে গরম কাপড়ে ঢেকে রাখা এবং গরম চা, কফি, বা মদ (লিকিওর) আর ব্যথা কমানোর জন্য ব্যথাহর ওষুধ খাওয়ান উচিত।

ব্যাপক হিমায়ন ঘটে ঠান্ডায় দীর্ঘসময় থাকলে, যখন শরীর জীবনরক্ষার জন্য প্রচুর তাপ-উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারে না। শরীরের তাপমাত্রা 20°-22°C তে নেমে আসা সাধারণত খুবই মারাত্মক। রক্তক্ষরণ, অনাহার, সাধারণ ক্লান্তি ও মদ্যপান জনিত উত্তেজনা এই ধরনের হিমায়নের সহায়ক। হিমাঘাতে প্রথমে শরীরে প্রচন্ড কাঁপুনি ধরে এবং পরে ক্লান্তি ও অপ্রতিরোধ্য তন্দ্রাচ্ছন্নতা দেখা দেয়। অতঃপর হাত-পা অসাড় এবং শ্বসন ও হৃৎপিন্ডের কার্যকলাপ দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্রুত সাহায্য না পেলে হিমাহত ব্যক্তি ঘুমের মধ্যেই প্রাণ হারায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা। হিমাহত ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে গরম করা উচিত; সতর্কভাবে শরীর ঘসে ঘসে বা স্নানপাত্রে রেখে ক্রমান্বয়ে জলের তাপমাত্রা বাড়িয়ে। শরীর নমনীয় হয়ে উঠলে তৎক্ষণাৎ কৃত্রিম শ্বসন ও হৃৎমর্দন শুরু করা প্রয়োজন।

সর্দিগর্মি ও তাপাঘাত (হিটস্ট্রোক)

অত্যধিক তাপ থেকেই তাপাঘাত ঘটে, যখন শরীর উচ্চতাপের সঙ্গে খাপখাওয়াতে ব্যর্থ হয়। ভিড়ের মধ্যে কিংবা যেখানে বায়ুচলাচলের সুব্যবস্থা নেই সেখানে কর্মরতদের মধ্যে তাপনিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। এই সঙ্গে মাথা খোলা থাকলে ও তাতে রোদ পড়লে সর্দিগর্মির আক্রমণ ঘটে।

সর্দিগর্মির প্রাথমিক লক্ষণ: মাথাধরা, কানে ভোঁ-ভোঁ করা, দুর্বলতা, মাথা-ঘোরা, বমির ভাব ও তৃষ্ণা। মানুষটি তারপরও রোদে থাকলে

অবস্থার অবনতি ঘটে: নাড়ী দুর্বল ও দ্রুততর হয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের জোর কমে যায়, পেটব্যথা ও পাতলা পায়খানা হতে থাকে। অবস্থা আরও খারাপ হলে খিঁচুনি, অস্থিরতাও দেখা দেয়, সংজ্ঞালোপ পায়, শরীরের চামড়া লাল ও গরম হয়ে ওঠে, চোখের মণি প্রসারিত হয় ও তাপমাত্রা 40°C-তে পেঁছয়।

সর্দিগর্মির তুলনায় এসব লক্ষণ তাপাঘাতে আরও দ্রুত প্রকটিত হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা। আহতকে ছায়ায় আনা, ঘাড় ও বুকে শক্ত করে আঁটা কাপড় খুলে ফেলা এবং মাথা, বুক ও ঘাড়ে ঠাণ্ডা সেঁক দেয়া প্রয়োজন। তাকে ঠাণ্ডা জল খেতে দিন। জ্ঞান হারালে ও শ্বসন বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম শ্বসনের ব্যবস্থা করুন।

কৃত্রিম শ্বসন ও বাহ্যিক হৃৎপিণ্ডমর্দন

মস্তিষ্কে এবং বক্ষ ও উদরের প্রত্যঙ্গগুলির পক্ষে ক্ষতিকর বড় আঘাত, বিশেষত যেগুলিতে যথেষ্ট রক্তক্ষরণ ঘটে, সেগুলি জীবনের পক্ষে অতিগুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ, বিশেষত রক্তসঞ্চালন ও শ্বসনে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

রক্তসঞ্চালনে রক্তসংবহনতন্ত্রে অবিরাম রক্তপ্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং তা মূলত হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। রক্তসঞ্চালন শরীরের যাবতীয় কোষকলায় অক্সিজেন ও খাদ্যবস্তু পেঁছয় এবং বিপাকক্রিয়াজাত বর্জ্য অপসারিত করে।

হৃৎপিণ্ডের ছন্দবদ্ধ সঙ্কোচন দুটি বদ্ধতন্ত্রে রক্তসঞ্চালন নিশ্চিত করে: বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর রক্তসঞ্চালন। বৃহত্তর সঞ্চালন বাম নিলয় থেকে শুরু হয়ে মহাধমনীতে পেঁছয়, বাম নিলয়ের পাম্প-করা সবটুকু রক্ত যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। রক্ত অতঃপর বড় ও ছোট ধমনীর সবগুলি শাখা-প্রশাখা দিয়ে দেহকোষে যায়, কোষকলীয় প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু ও অক্সিজেন সরবরাহ করে, ভেঙ্গে-পড়া উৎপাদক ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সরিয়ে আনে এবং পরিশেষে শিরার মধ্য দিয়ে ডান অলিন্দে পেঁছয়। তাই কার্বন ডাই-অক্সাইড সম্পৃক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান দিকে সঞ্চিত হয়। ধমনীরক্তে পরিবর্তিত হওয়ার আগে এই রক্তকে অবশ্যই ফুসফুস অতিক্রম করতে হবে। ফুসফুসেই গ্যাস-বিনিময় ঘটে: কার্বন ডাই-অক্সাইড

বেরিয়ে যায় ও রক্ত অক্সিজেনে ভরে ওঠে। এটাই ক্ষুদ্রতর সঞ্চালন। এটা শুরু হয় ডান নিলয় থেকে, শেষ হয় বাম অলিন্দে, যাতে ফুসফুস থেকে আসা অক্সিজেনপূক্ত ও ধমনীরক্ত হয়ে-ওঠা রক্ত পেঁছয়। বাম অলিন্দের রক্ত বাম নিলয় টেনে নেয় এবং সেখান থেকেই মহাধমনীর মাধ্যমে শুরু হয় বৃহত্তর সঞ্চালন। অক্সিজেন পরিবাহিত হয় হিমোগ্লবিনে — রক্তের সংগঠক উপাদানে অর্থাৎ লোহিত রক্তকণিকা বা ইরিত্রসাইটের মধ্যবর্তী রক্তকণিকায়। অব্যাহত রক্তসঞ্চালন ও স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার জন্য হৃৎপিন্ডের প্রগাঢ় সঙ্কোচন অপরিহার্য। এটা বড় বড় ধমনীতে যে-চাপ সৃষ্টি করে তাতে পারদস্তম্ভকে 120-130 মি. মি. উঁচুতে তোলা যায়। এই চাপই সর্বোচ্চ রক্তচাপ। হৃৎপিন্ডপেশী প্রসারিত হলে চাপ 70-80 মি. মি.-এ নেমে যায়। এটা সর্বনিম্ন রক্তচাপ। হৃৎপিন্ডের কার্যকলাপ ও রক্তসঞ্চালনের অবস্থা হৃৎপিন্ড সঙ্কোচনের হার ও শক্তি থেকে জানা যায়।

শ্বসনতন্ত্র হল স্বরযন্ত্র, শ্বাসনালী, ক্লোমনালী ও ফুসফুসের সমাহার। শ্বসন বস্তুত দেহ ও তার প্রতিবেশের মধ্যে গ্যাস-বিনিময়েরই নামান্তর। শ্বাস নেওয়ার সময় বুক চওড়া হয়, ফুসফুস সম্প্রসারিত হয়ে বাতাস টেনে নেয়। বাতাস ফুসফুসের কোটর ও বায়ুকোষে পেঁছয় এবং এগুলির পাতলা দেয়ালে অসংখ্য সূক্ষ্ম রক্তনালী থাকে। বায়ুকোষেই গ্যাস-বিনিময় ঘটে — শিরারক্ত থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে বেরিয়ে যায় ও রক্ত অক্সিজেনে ভরে ওঠে।

শ্বাস ফেলার সময় অল্প পরিমাণ অক্সিজেন ও অঢেল কার্বন ডাই-অক্সাইত যুক্ত বাতাস ফুসফুস থেকে বেরিয়ে যায়।

শ্বসন, শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ বস্তুত মস্তিষ্কস্থ স্বয়ংক্রিয় এক শ্বসনকেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রক্তে বিগলিত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সম্পর্কে এই স্নায়ুকোষগুলি খুবই সংবেদী এবং রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে সেগুলি শ্বসনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

রক্তসঞ্চালন ও শ্বসনের বিঘ্নের নিরিখেই আহতের অবস্থার গুরুত্ব নির্ণেয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদাতাকে অবশ্যই দ্রুত পরিস্থিতিটি বুঝতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার ত্বরা, ক্রম ও ধরন নির্নয় করা যায়।

আহত লোকটি জীবিত না মৃত?

রক্তসঞ্চালন ও শ্বসনের অবস্থা সম্পর্কে খুব সাধারণ পরীক্ষার সাহায্যেই প্রশ্নটির উত্তর দেয়া যায়।

আহতের বাঁ-দিকের স্তনবৃন্তের কাছে নিজের কান চেপে ধরে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনে এবং নাড়ী (র‍্যাডিয়াল, ফিমরেল বা ক্যারোটিড ধমনী) ধরে হৃৎসঙ্কোচন সনাক্ত করা যায়। হৃস্পন্দন দুর্বল হলে নাড়ী-স্পন্দন শরীরের প্রত্যন্ত অংশে পৌঁছয় না বলে র‍্যাডিয়াল বা ফিমরেল ধমনীতে নাড়ী না পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ঘাড়ে অবস্থিত ক্যারোটিড ধমনী হৃৎপিণ্ডের কাছে থাকার দরুন হৃৎস্পন্দন খুব দুর্বল হলেও তাতে স্পন্দন পাওয়া যায়। নাড়ীর স্পন্দনই হৃৎপিণ্ডের সক্রিয়তার প্রমাণ।

ক্যারোটিড নাড়ী এভাবে পাওয়া যায়: গলগ্রন্থিটিকে (থাইরয়েড গ্রন্থি) একদিকে বুড়ো আঙুল ও অন্যদিকে তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে চেপে ধরে মেরুদণ্ডের দিকে পিছলে নিন। হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন থাকলে আঙুলের ডগায় ক্যারোটিড নাড়ীর স্পন্দন ধরা পড়বে (50 নং ছবি)। বাহ্যিক শ্বসন, শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাস ফেলার সময়কার বুকের উঠা-নামা থেকে সনাক্ত করা যায়।

শ্বসন অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার দরুন তা বোঝা না গেলে আহতের মুখের ও নাকের কাছে একটি আয়না ধরুন। আয়নায় বাষ্পের আঁচ থেকে শ্বসনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক মানুষের চোখের মণি আলোতে সুস্পষ্ট সাড়া দেয়। চোখে টর্চ মারলে চোখের মণি সঙ্কুচিত হয়। দিনের বেলা আহতের চোখ
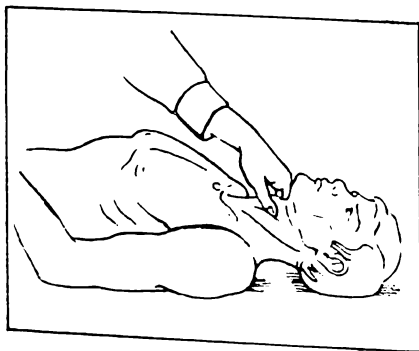
চিত্র 50. ক্যারোটিড ধমনীতে নাড়ীপরীক্ষা

হাত দিয়ে ঢেকে তৎক্ষণাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে তা পরীক্ষা করা যায়। চোখের মণির সঙ্কোচন প্রাণের প্রমাণ। কিন্তু খুববেশি অজ্ঞান অবস্থায় এতে সাড়া মেলে না।

হৃৎপিণ্ড নিশ্চল হলে ও শ্বসন থেমে গেলে বিপাকক্রিয়ায় দারুণ বিঘ্ন ঘটে। অক্সিজেন-বাহী রক্তধারা কোষে পৌঁছয় না ও অক্সিজেনের বুভুক্ষায় কোষের মৃত্যু ঘটে। অবশ্য এতে তৎক্ষণাৎ মানুষ মারা যায় না।

অত্যধিক সুসংগঠিত মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি অক্সিজেনের অভাবের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদী বিধায় হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার 5-7 মিনিটের মধ্যেই সেগুলি মারা যায়। 'ক্লিনিক্যাল মৃত্যু' কথিত এই সময়ের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ও শ্বসন চালু করতে পারলে আহতকে বাঁচান যায়। পরে, হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার 8-10 মিনিটের মধ্যে মস্তিষ্কের বহিস্তরের কোষগুলিতে অনন্যমুখী পরিবর্তন ঘটে ও জৈবিক মৃত্যু শুরু হয়। অতঃপর মানুষকে আর বাঁচান যায় না।

মৃত্যুর আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত লক্ষণ আছে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সনাক্ত করা না গেলে, আহতের শ্বসন বন্ধ থাকলে, সে সূচের খোঁচায় সাড়া না দিলে, আলোর ঝলকানিতে চোখের মণি অসাড় হলেও প্রাণরক্ষার চেষ্টা বন্ধ না-করার যথেষ্ট কারণ থাকে। সব আশার সম্ভাবনা শেষ না হওয়া অবধি তা চালিয়ে যেতে হবে। মৃত্যুর প্রকটিত চরম লক্ষণগুলিই এক্ষেত্রে নির্ধারক হবে: ঘোলাটে শুকনো অক্ষিপটল (কর্নিয়া), শরীর ঠাণ্ডা হওয়া, শব-চিহ্ন ও শবকাঠিন্য বা শরীর শক্ত হওয়া। এক্ষেত্রে আঙুল দিয়ে চোখের কোনাগুলি চেপে ধরলে চোখের মণি অদ্ভুতভাবে সঙ্কুচিত হয়ে চোখ 'বিড়ালাক্ষী' হয়ে ওঠে।

মৃত্যুর পর মহাকর্ষের দরুন শরীরের নিচের দিকে রক্তপ্রবাহ জনিত রক্তাধিক্য থেকে শব-চিহ্ন ফুটে ওঠে। চিৎ হয়ে থাকা মড়ার ক্ষেত্রে এগুলি কাঁধ, কটি ও নিতম্বে দেখা দেয়। মড়া উপুড় হয়ে থাকলে শব-চিহ্ন থাকে মুখে, বুকে, বাহুতে ও পায়ে। শবকাঠিন্য শুরু হয় মৃত্যুর 2-4 ঘণ্টা পর। এতে পেশী শক্ত হয়ে ওঠে এবং মড়ার মাথা ঘুরান, কোন প্রত্যঙ্গ সোজা বা বাঁকা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

শ্বসন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে শ্বসনতন্ত্রে বায়ুপ্রবেশ বন্ধের বাহ্যিক হেতুর সংযোগ থাকতে পারে। যেমন, অজ্ঞান অবস্থায় জিহ্বা উল্টে সেঁধে যাওয়া

অথবা মুখে, গলায়, বায়ুনলে বাহ্যবস্তু (বমি, জল, ময়লা, কাদা, নানা কঠিন পদার্থ, খাদ্য) আটকান।

চিৎ-হয়ে পড়ে থাকা আহত অজ্ঞান ব্যক্তির জিহবার গোড়া গলায় সেঁধে যায় ও বায়ুনলে বায়ুপ্রবেশ বন্ধ করে দেয়। জিহবা ও গলার পেশীগুলি শ্লথ হওয়ার জন্যই এমনটি ঘটে। এক্ষেত্রে বুকের উঠা-নামা (শ্বসনক্রিয়া জনিত বিচলন) অটুট থাকে কিন্তু সাধারণত শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে শ্বসনের যে-শব্দ ওঠে তা শোনা বা বায়ুপ্রবাহের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

বায়ুনলে কোন বাহ্যবস্তু আঁটকে গেলেও অভিন্ন অবস্থা ঘটে। এমনটি সাধারণত ঘটে শ্বাস নেওয়ার সময় শ্বসনতন্ত্রে বমি ঢুকে গেলে ও জলে ডুবলে জল ও কাদা প্রবেশ করলে। উল্টান জিহবায় বা বাহ্যবস্তুতে শ্বসনতন্ত্রের উপরের দিক আংশিক আটকে গেলে শ্বাস নেওয়ার সময় ফেঁস্‌ফেঁসে শব্দ সহ আক্ষেপযুক্ত শ্বসন শোনা যায়।

শ্বসনজনিত বিচলন দুর্বল হলে, চামড়া ও ঠোঁট নীল হয়ে উঠলে প্রতি মিনটে নাড়ীর বেগ 110 বা ততোধিক হলে ফুসফুসের জন্য সহায়ক বায়ুচলাচল ব্যবস্থা অর্থাৎ কৃত্রিম শ্বসন প্রয়োজন।

কৃত্রিম শ্বসনের আগে শ্বসনতন্ত্রের বায়ুচলাচলের পক্ষে কিছু আটকে আছে কিনা প্রাথমিক চিকিৎসাদাতা তা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। মুখ থেকে
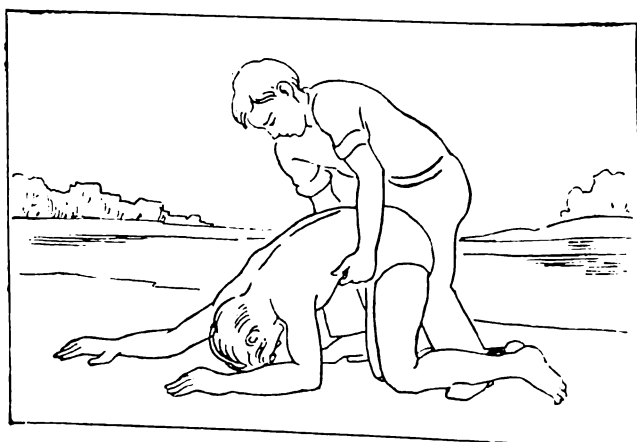
চিত্র 51. জলমগ্ন লোকের ফুসফুস থেকে জল বের করা

বমি ও নোংরা বস্তু এবং ফুসফুস থেকে জল বের করা প্রয়োজন (জলে ডুবলে, 51 নং ছবি)

রক্ষাকারী ব্যক্তি ডুবে-যাওয়া লোকের বুক একটি পিপা, সিলিণ্ডার বা নিজের হাঁটুর উপর রাখবেন ও শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঝুলে থাকবে। হাত দিয়ে লোকটির বুকে চাপ দেবেন। জল বের করার জন্য বেশি সময় নেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ, জল না-ও থাকতে পারে। অচিরেই কৃত্রিম শ্বসন শুরু করুন।

কৃত্রিম শ্বসনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ প্রণালী: মুখ বা নাক দিয়ে ফুসফুসে বাতাস ঢুকান (মুখে মুখ লাগিয়ে বা নাকে মুখ লাগিয়ে কৃত্রিম শ্বসন — 'প্রাণচুম্বন।')। রক্ষাকারী নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিজের ফুসফুসের বাতাস দিয়ে তা করতে পারেন। এই বাতাসে যথেষ্ট অক্সিজেন থাকে ও তা আহতের প্রাণরক্ষার উপযোগীও বটে।

শ্বসনতন্ত্রে বায়ুচলাচলের সর্বোত্তম পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য লোকটিকে চিৎকরে শোয়ান, মাথা ঢালু করুন, নিচের চোয়াল সামনের দিকে ঠেলুন (52 নং ছবি)। মাথা পেছনে আনলে জিহ্বার গোড়া গলার পেছন থেকে সরে যায়, গলা ও শ্বাসনালীর পথ উন্মুক্ত হয় (অজ্ঞান হয়ে যাওয়া 80% ভাগ আহতের ক্ষেত্রেই তা ঘটে)।

আহতের মাথা ঢালু করার জন্য তার ঘাড়ের পেছনে একটি হাত রাখুন, অন্য হাতে কপালে চাপ দিন। আহতের মুখ খুলে যাবে। এতে শ্বসনতন্ত্র পুরো না খুললে (ভেতরে আসা বাতাস ফুসফুসে পেঁছয় না ও বুক ফুলে ওঠে না) নিচের চোয়াল নিম্নোক্তভাবে সামনের দিকে ঠেলুন। রোগীকে চিৎ-করে শোয়ান, নিচের চোয়ালের কোনাগুলি পেছনের দিক থেকে প্রত্যেক হাতের চার আঙুল দিয়ে ধরুন। গালের হাড়ের উপর বুড়ো আঙুল চেপে ধরে নিচের চোয়াল সামনের দিকে ঠেলুন, যাতে নিচের চোয়ালের দাঁতগুলি উপরের চোয়ালের দাঁতের সামনে আসে।

মাথাটি পেছনে আনলে ও নিচের চোয়াল সামনের দিকে সরে এলে জিহ্বা সাধারণত পেছনে যায় না ও শ্বাসনালীর পথ খুলে যায়।

উপর ও নিচের চোয়ালের খিঁচুনি থাকলে মুখ পরিষ্কার ও কৃত্রিম শ্বসন শুরু করা খুবই কঠিন। এজন্য বিবিধ পদ্ধতি প্রযোজ্য: তর্জনীগুলি গালের পেছনের দিকে গালের মধ্যে রেখে আঙুলের ডগাগুলি পেছনের

পেষণদন্তের পেছনে গড়িয়ে নিন ও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙুলের ডগা চোয়ালগুলির মাঝখানে ঢুকান ও সেগুলি খুলুন।
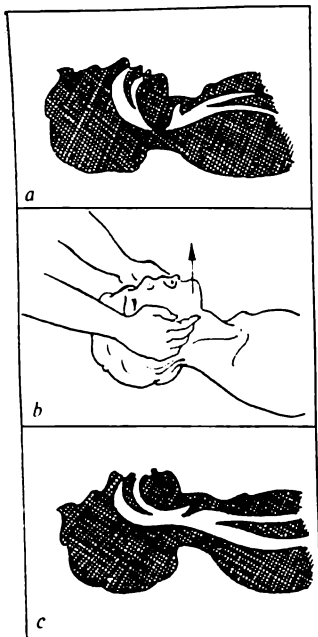
চিত্র 52. জিহবার পশ্চাদগমন নিয়ন্ত্রণ a-জিহবার গোড়া গলা বন্ধ করে দিয়েছে; b, c-নিচের চোয়াল সামনের দিকে ঠেলে জিহবা সরিয়ে দেয়া ও ও শ্বাসনালী মুক্ত করা

আহত কিছুটা অব্যাহতি পেলে আড়াআড়ি আঙুল দিয়ে তার মুখ খুলুন ও থুতনির উপর চাপ দিয়ে নিচের চোয়াল নামান। সাহায্যকারী তখন আহতের নাকে চিমটি কাটবেন, গভীরভাবে শ্বাস নেবেন এবং আহতের মুখে মুখ লাগিয়ে তার ভেতর নিঃশ্বাসের বাতাস ঢুকাবেন। এতে প্রশ্বাস পরোক্ষ ক্রিয়া এবং বুক ও মধ্যচ্ছদার পেশীগুলি শ্লথ হওয়ার দরুন পাঁজরের স্বাবলম্বী পতনের মধ্যে তা নিষ্পন্ন হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে একইসঙ্গে মুখ ও নাকে বাতাস বয়ে চলে। তারা ছন্দবদ্ধভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে মিনিটে 16-20 বার (53 ও 54 নং ছবি)।

থেমে যাওয়া হৃৎপিণ্ডে আবার স্পন্দন চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় মর্দনের মাধ্যমে ছন্দবদ্ধভাবে বুকে চাপ দেয়া হয়, যাতে রক্তকে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তনালীতে ঠেলে দেয়া যায় ও আবার রক্তসঞ্চালন চালু হয়।

হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে পাঁজরের হাড় ও মেরুদণ্ডের মাঝখানে থাকে। পাঁজরে কিছুটা জোরে চাপ দিলে পাঁজর ও কোমলাস্থির স্থিতিস্থাপকতার জন্য তা মেরুদণ্ডের দিকে 5 বা 6 সেণ্টিমিটার ভেতরে ঢুকে যায় এবং ফলত হৃৎপিণ্ডের কক্ষগুলির উপর চাপ পড়ে। এভাবে কৃত্রিম হৃৎকুঞ্চন ঘটে। রক্তকে বাম নিলয় থেকে মহাধমনীতে জোরে ঠেলে
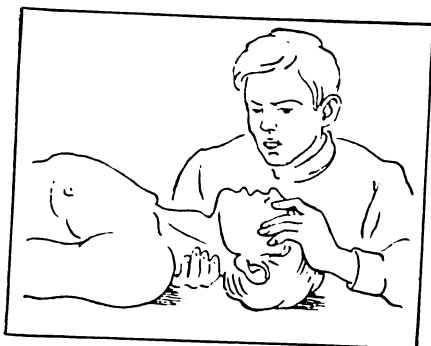
চিত্র 53. মুখ দিয়ে কৃত্রিম শ্বসন। রক্ষাকারী আহতের মাথা একটু ঢালু করেন, বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে নাকে চিমটি কাটেন এবং জোরে শ্বাস নেন।
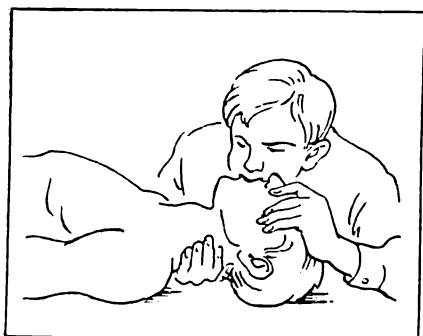
চিত্র 54. আহতের মুখে জোরে ঠোঁট চেপে ধরে রক্ষাকারী নিজের ফুসফুস থেকে আহতের ফুসফুসে বাতাস ঢুকান

দেয়া হয় এবং তা সেখান থেকে সারা দেহে; বিশেষত মস্তিষ্ক ও হৃৎপিন্ড পেশীবর্তী করোনারি নালীতে পেঁছয়। একইসঙ্গে ডান নিলয় থেকে রক্ত ফুসফুসে যায় ও সেখানে অক্সিজেনপূক্ত হয় (55 নং ছবি)।

পাঁজরের উপর থেকে চাপ সরিয়ে নিলে বুকের স্থিতিস্থাপকতার দরুন বুক ফুলে ওঠে এবং শোষিত হয়ে আসা রক্তে হৃৎপিন্ড আবার ভরে যায়।

বাহ্যিক হৃৎমর্দনে কিছু নিয়ম অবশ্যপালনীয়। দৈবাৎ ঘটলেও, পাঁজরের হাড় যাতে ভেঙ্গে না যায়, সেদিকে নজর রাখা, মর্দনের সঠিক জায়াগাটি জানা ও উপযুক্ত পরিমাণ চাপ দেওয়া প্রয়োজন।

দু'আঙুল চওড়া দুরত্বে হাতদুটি পাঁজরের হাড়ের শেষপ্রান্তের উপরে রাখুন। হাতের তালু দিয়ে পাঁজরে নিচের দিকে চাপ দিন যাতে

তা বয়স্কদের ক্ষেত্রে 5-6 সেণ্টিমিটার ঢুকে যায় এবং সেই অবস্থায় আধা সেকেন্ড রেখে হাত তুলে নিন।

প্রতি মিনিটে অন্তত 60-70 বার ছন্দবদ্ধ চাপপ্রয়োগ (মর্দন) এবং এইসঙ্গে কৃত্রিম শ্বসনের মাধ্যমে প্রাণধারণের জন্য যথেষ্ট রক্তসঞ্চালন পুনরায় চালু করা যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে এক হাতেই হৃৎমর্দন করতে হয়। নবজাত ও কোলের শিশুর ক্ষেত্রে এজন্য দুই আঙুলের ডগা ব্যবহার্য। কিন্তু মর্দনের হার বাড়াতে হবে মিনিটে 100-120 বার। শুদ্ধ হৃৎমর্দন ও পাঁজরে যথেষ্ট চাপপ্রয়োগের ফলে ক্যারোটি ও ফিমরেল ধমনীতে কৃত্রিম স্পন্দন দেখা দেয়।

মারাত্মক আঘাতের দরুন হৃৎপিন্ডের কার্যকলাপ ও শ্বসন বন্ধ হয়ে গেলে এবং জৈবমৃত্যুর চূড়ান্ত লক্ষণগুলি স্পষ্ট না হলে. তৎক্ষণাৎ পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা শুরু করা প্রয়োজন। কৃত্রিম শ্বসনের মাধ্যমে ফুসফুসে গ্যাস-বিনিময় অব্যাহত রাখা ও মর্দনের সাহায্যে পুনরায় হৃৎপিন্ডের কার্যকলাপ চালু করাই পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্য।

বাহ্যিক হৃৎমর্দনে স্বাভাবিক রক্তসঞ্চালনের 10-30% ভাগ রক্ত পরিবাহিত হলে তা মস্তিষ্কের রক্তসরবরাহ অটুট রাখা ও মস্তিষ্কের বহিস্তরের স্নায়ুকোষগুলির মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট।
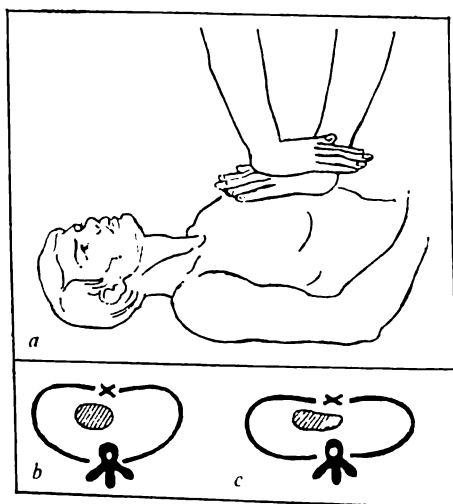
চিত্র 55. a-বাহ্যিক হৃৎমর্দন; b, c-বুকের প্রস্থচ্ছেদের ছবি; b-পাঁজরের হাড়ে চাপ দিয়ে রক্তকে হৃৎপিন্ড থেকে রক্তনালীতে সরিয়ে দেয়া হয়; c-চাপ সরিয়ে নিলে হৃৎপিন্ড প্রসারিত হয় ও রক্তে ভরে ওঠে

পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে আহতকে হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠানোর জন্য কিছুটা সময় পাওয়া যায়।

জীবনের পক্ষে মারাত্মক আঘাতের ঘটনা ব্যতিরেকে দ্রুত ও শুদ্ধ হৃৎমর্দনে সহজেই হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় সক্রিয় করা সম্ভব।

পুনরুজ্জীবনের ক্রম ও পদ্ধতি। আহতকে কঠিন সমতলে (টেবিল, মেঝে, মাটিতে) চিৎ-করে শোয়ান, নাকে চিমটি কাটুন, ফুসফুসে কয়েকবার বাতাস ঢুকান। একইসঙ্গে হৃৎমর্দন দিন। একইসঙ্গে দুজন কাজ করবে— একজন হৃৎমর্দন, অন্যজন কৃত্রিম শ্বসন। প্রতি পাঁচটি হৃৎমর্দনে একবার করে ফুসফুসে বাতাস ঢুকান। একজন লোক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চালালে প্রতি 15 টি হৃৎমর্দনে দু'বার ফুসফুসে বাতাস ঢুকান প্রয়োজন।

প্রতি দু'মিনিট অন্তর সামান্য বিরতি দিয়ে হৃৎপিণ্ড আপনা থেকে চালু হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করুন।

হৃৎমর্দনের ফলপ্রসূতার লক্ষণ: ক্যারোটিড ও ফিমরাল ধমনীতে সুস্পষ্ট নাড়ীর স্পন্দন, ঠোঁটের শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ও চামড়ার গোলাপী রং, চোখের মণির সংকোচন। প্রয়োজনীয় না হওয়া সত্ত্বেও পেছনের দিকে ঝুলান ও চাপ দিয়ে ফুসফুসে বাতাস ঢুকানের কাজ শুদ্ধভাবে করা হলে এতে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু শ্বসনতন্ত্র অবরুদ্ধ হলে ঢুকান বাতাসের পুরোটাই পেটে চলে যেতে পারে ও তাতে পেট ফুলে উঠবে। এমনি তা ততটা মারাত্মক না হলেও এতে বমি হতে পারে ও বমি শ্বসনতন্ত্রে ঢুকে তা আটকে দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। মুখে মুখ লাগিয়ে ফুসফুসে বাতাস ঢুকানোর সময় পেটের উপরের অংশ ফেঁপে উঠলে পাঁজরের শেষপ্রান্ত ও নাভির মধ্যকার এলাকার পেটের অংশে চাপ দিয়ে অবশ্যই বাতাস বের করে নিতে হবে।